নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস
ডাউন হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট। সুজিত দাস

নতুন ধারাবাহিক কলম
রাজনগরের রাজনীতি। অরবিন্দ ভট্টাচার্য
এ নদী কেমন নদী। তুহিন শুভ্র মণ্ডল
আসামের চিঠি। সমর দেব

অন্যান্য ধারাবাহিক
ইতিহাস। রেনী-র ডুয়ার্স
উপন্যাস। তাজ্জব মহাভারত

গল্প। ছন্দা বিশ্বাস

উত্তরে বাংলার মুক্ত কণ্ঠ

এখন ডুয়ার্স

ফেব্রুয়ারি ২০২০। ২০ টাকা

জল। জঙ্গল। জনসত্তা

গান্ধী ১৫০
দেবপ্রসাদ রায়ের
দীর্ঘ নিবন্ধ।

ডুয়ার্স সাহিত্য উৎসব ২০
সম্পাদকীয়
প্রতিবেদন

1st DOOARS Literary Fest
January 18 & 19, 2020

পাহাড় ছেড়ে ডুয়ার্সে!

শীতে পরিযায়ী মানুষের ঢল নামে হিমালয়ের কোলে। শোনা যায় সেখানে এখন শান্তির মনোরম বাতাস। পাহাড় জুড়ে হোম স্টে-র তুখোড় জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে দিচ্ছে গ্রামীণ পাহাড়িদের কর্মসংস্থানের সুযোগ মিলছে। তবু এই অনিন্দ্য সুন্দর পথে দলে দলে কেন নেমে আসছে তারা সমতলে, কেন বাসা বাঁধছে ডুয়ার্সে, কোন উষ্ণ জীবনের খোঁজে?

এখন ডুয়ার্স **সম্পাদকের চিঠি**

পাহাড় ছেড়ে ডুয়ার্সে!

এ এক আশ্চর্য প্রশ্নের মুখে পড়ে গিয়েছি আমরা। আজব এক ধাঁধার মতই। যেমন শীতে পরিযায়ী পাখিরা পাহাড় থেকে নেমে আসে। শীতে পরিযায়ী মানুষের ঢল নামে হিমালয়ের কোলে। একপক্ষ নামে উচ্চ হিমাংক থেকে নীচে, অপর দল নীচ থেকে উপরে ওঠে। কিন্তু সেখানে বছরভর বাসা বাঁধে না কোনওপক্ষই। শোনা যায় পাহাড়ে এখন শান্তির মনোরম বাতাস শীতকে নাকি আরও গাঢ়, আরও উপভোগ্য করে তোলে! গোটা পাহাড় জুড়ে হোম স্টে-র তুখোড় জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে দিতে পারে গ্রামীণ পাহাড়িদের কর্মসংস্থানের সুযোগও মিলছে। তবু কেন এই অনিন্দ্য সুন্দর পথে দলে দলে কেন নেমে আসছে তারা সমতলে, স্থায়ী ঘর বাঁধছে, কোন উষ্ণতার খোঁজে? কেমনভাবে দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে এখানকার জনবিন্যাস ও চিরন্তন সংস্কৃতি? সুযোগসন্ধানী রাজনীতির নেতা মানুষগুলি দশকের পর দশক ধরে তার সদ্ব্যবহার করে যাচ্ছেন কীভাবে?

প্রশ্নগুলি কি সমীচীন নয়? কলকাতায় বসে বা মাঝেমধ্যে বেড়াতে এসে এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। বাংলার উত্তরে নিজের চেনা চৌহদ্দির বাইরে গেলেই এ প্রশ্ন জ্বলন্ত হয়ে উঠবে। আপনার রোজকার পথে বাজারে চলাফেরায় এ প্রশ্ন প্রকট হয়ে উঠবেই। অথচ উত্তরের বুদ্ধিজীবী-লেখক-কবি-গবেষক সমাজে এ নিয়ে কোনও ভ্রূকুঞ্চন নেই কেন আজও? প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ধ্বজাধারী লিটল ম্যাগাজিনগুলি সাহিত্য উৎসবে কেন সোচ্চার হয়ে উঠছে না? কেন পাহাড়ে এই গণ-নিস্ক্রমণ? পুরোটার জন্যই কি রাজনৈতিক অস্থিরতা একমাত্র দায়ী? কেন উত্তরের কোনও এনজিও বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবা কোনও গবেষক সংস্থার এ নিয়ে স্টাডি জোরদার হচ্ছে না? উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিমালয়ান স্টাডিজ বিভাগ কি এই প্রশ্নাবলীকে আদৌ গুরুত্ব দিতে চাইছেন? ইতিমধ্যে যদি কিছু অগ্রগতি হয়েও গিয়ে থাকে তবে তা প্রশংসনীয়, আমাদের অজ্ঞতাকেই প্রমাণ করবে মাত্র।

আপনি সহজ বামপন্থী ভাবনায় জারিত হলে হয়ত পাল্টা প্রশ্ন তুলবেন, আপনি পাহাড় আর সমতলকে আলাদা করছেন কেন? ওরা সমতলকে নিজের মাটি ভেবে নেমে আসতেই পারে। এটা ওদের মৌলিক অধিকার। আপনি এভাবে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেন না।

উগ্রবাম হলে আপনি সোজাসুজি বলে দেবেন, আপনারা মিডিয়া আসলে বুর্জোয়া শক্তির দালালি করেন। বিভেদের প্রশ্নটা মনে আনেন কেন? আমরা পাবলিক কি এতই বোকা?

আবার আপনি দক্ষিণপন্থী হলে মৃদু ভাষায় জানাবেন, এ সরকার এত কাঁচা কাজ করে না গুরু, পাকা আইন এসে গেছে। লাগু হলেই দেখবে ঘরের ছেলেরা হঠাৎ ঘরের প্রতি টান অনুভব করছে। আপনে আপ সব ফিরে আসতে বাধ্য।

আর আপনি উগ্র দক্ষিণ হলে (যেমন বজরংপন্থী) হলে বলবেন, চিন্ত করবেন না স্যর। কদিন ইন্টারনেট বন্ধ করে দিলেই তো সব কাত, পুতুলের মত টপকে পড়বে একে একে।

যে যাই ভাবুক, আমাদের প্রশ্নে কোনও বিভেদ-গন্ধ কেউ পেলে অবাক হব না। অথচ আমরা জানিই না, এরা দুজনেই কেমন পালা করে বিভেদের এই চারাটিতে জল দিয়ে একে মহাবৃক্ষ করে তুলছে! কারণ বৃক্ষই আমাদের ভবিষ্যৎ, শ্বাপদের জঙ্গলে আমাদের রক্ষা বা শাসন করবে বৃক্ষরাই।

যে প্রশ্ন আজ জেগেছে সম্পাদকের দপ্তরে ও ভাবনায়, তার নিরসন ঘটাতে আমরা দ্রুত উদ্যোগী হব, বলাই বাহুল্য। ডুয়ার্স থেকে আমরা যাব পাহাড়ে। লক্ষ্য রাখবেন আগামী সংখ্যাগুলিতে। কিছু আনকোরা প্রতিবেদনের জন্য।

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

এখন ডুয়ার্স পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি	
বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড	৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির	
অনুপ দাস, শিবমন্দির বাজার	৯৫৬৪৯৯৮৫৬১
জলপাইগুড়ি	
ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে	৯৭৩৩২৪৬৯১৩
মালবাজার	
সম্রাট (হোম ডেলিভারি)	৯৩৩২০০৫৮৬৫
চালসা	
দিলীপ সরকার, চালসা মোড়	৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি	
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল	৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া	
বরুন ঘোষ, পোকিসা	৯৫৯৩৩৫৪১৫২
মাদারিহাট	
জগৎ চৌধুরী (হোম ডেলিভারি)	৯৩৮২৯৭৭৬২৯
লাটাগুড়ি	
সৌমেন (হোম ডেলিভারি)	৯০০২৪০৯৮৯৩
ময়নাগুড়ি	
দেবাশিষ বসুভাট	৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ফালাকাটা	
অমল চন্দ্র পাল	৯৪৩৪৪১২৬৪৯
তুফানগঞ্জ	
আনন্দবাজার বুক স্টল	৯৩৩৩৬৮৮৬৭১
দিনহাটা	
হরিপদ রায়	৯৯৩২৬৩৯০৬৮
আলিপুরদুয়ার	
দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট	৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার	
জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে	৯৪৩৪২১৭০৮৪
মালদা	
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি	৭৮৬৪৯৯৫৫১৫
বালুরঘাট	
নীলাদ্রিশেখর মুখার্জি	৬২৯৫৯৮৭২৭৮
ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন	৯৮৩০৪১০৮০৮
কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক	
বিশাল বুক সেন্টার	৪০৬৪৪০৯৭

এখন ডুয়ার্স

ষষ্ঠ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০২০

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

সাহিত্য বিভাগ সম্পাদনা
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদনা
শ্বেতা সরখেল

অলংকরণ
শান্তনু সরকার

সার্কুলেশন
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ইমেল
ekhonduars@yahoo.com

প্রচ্ছদ বিরূপাক্ষ মিত্র

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস।
অনিমা ভবন। শান্তি পাড়া।
জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এই সংখ্যায় যা আছে

সম্পাদকের চিঠি ২

ধারাবাহিক প্রতিবেদন
সার্জেন রেনী'র ডুয়ার্স যুদ্ধের ডায়েরি ৬

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন
গান্ধীকে আজ অপহরণের চেষ্টা চলছে ১০

আসামের চিঠি
বাঙালি জঙ্গিদের আত্মসমর্পণ কি স্রেফ নাটক? ১৬

এ নদী কেমন নদী
নদী বাঁচানোর আওয়াজ উঠছে দক্ষিণ দিনাজপুরে ১৮

ডুয়ার্স সাহিত্য উৎসব ২০২০
অ্যালবাম ২০

পর্যটন
বউ সাথে পথে পথে ২২

রাজনগরের রাজনীতি
বন্যা বা বঙ্গাল খেদাও বাড়িয়েই চলল উদ্বাস্তু ভিড় ২৪

ধারাবাহিক উপন্যাস
ডাউন হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট ২৬

ধারাবাহিক কাহিনি
তাজ্জব মহাভারত ৩০

গল্প
ক্ষমা করবেন স্যার ৩৪

কবির কলমে
রানা সরকার ৩৬

শ্রীমতি ডুয়ার্স
মাদ্রী অনুচ্চারিত দৃঢ়চেতা এক প্রেমিকার নাম ৩৭

উত্তরের উপকথা
একটি গীতিকার কিস্‌সা ৩৮

নিয়মিত বিভাগ
ফেসবুক পোস্ট ৪
খুচরো ডুয়ার্স ৫
রাসায়নিক রস ৩৯

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)
Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only
Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Rates are effective from April 1, 2018 issue

এখন ডুয়ার্স

Mechanical Details: Full Page Bleed {21cm (W) X 28 cm (H)}, Non Bleed {18cm (W) X 25 cm (H)}, Half Page Horizontal {18 cm (W) X 12 cm (H)}, Vertical {8.5 cm (W) X 25 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5.6 cm (W) X 25 cm (H)}, Horizontal 18 cm (W) X 6.5 cm (H), 1/4 Page 8.5 cm (W) X 12 cm (H), 1/6 Page {5.75 cm (W) X 12.2 cm (H)}

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩ উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

মেলা ও মথুরা কেক

নীলা বন্দ্যোপাধ্যায়
জানুয়ারি ২৮

গ্রামীণ মেলাগুলো কবেই তার চরিত্র হারিয়েছে। জীবনে প্রথম যে মেলা আমার স্মৃতিতে আছে তা হলো খুব ছোটবেলায় সিঙ্গুরেরই ভেতর দিকে একটি গ্রামে চড়কের মেলা। সে মেলা কালের নিয়মে আমার কাছে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। শুধু মনে আছে হাতে ঘোরানো কাঠের নাগরদোলা আর আগুনের ওপর হেঁটে যাওয়া একটা লোক। আগুনে হেঁটে যাওয়া লোকটাকে দেখে ভারি ভয় পেয়েছিলাম আমি, ভয়ে কেঁদে উঠতে কেউ বলেছিলো ও সন্ন্যেস রেখেছে, ওর কিছু হবে না। আসলে তখন জানতাম না বড়দের জীবন মানেই আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া। কেবল সন্ন্যেস রাখা হয়না বলে কখনও কখনও পায়ে ফোস্কা পড়ে। যদিও মেলার কথা বলতে গিয়ে এই সব গুরুগম্ভীর কথা বলার মানেই হয়না, তবুও স্বভাব দোষে বলে ফেলি। আর একটা মেলার কথা খুব মনে পড়ে জানেন, বাবার সঙ্গে একবার নবমীর দিন পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে গেছিলুম। খুব ছোট তখন আমি। সেই প্রথম পোড়া মাটির দুগগা দেখেছিলাম। আদিবাসী নারী, পুরুষ, রঙিন কাগজের হাওয়া মোরগ, কাঁচের চুড়ি এসব আমার মন কেড়েছিলো ঠিকই, কিন্তু তার চেয়ে বেশি মনে ধরেছিলো বায়োস্কোপের বাক্স। সে বাক্সে চোখ দিয়ে গোবিন্দা, মিঠুন, রোগা গাল ভাঙা সালমান খান, দিব্যা ভারতী আর অসভ্য জামা পরা কিম কাতকার দেখেছিলুম। সেই সঙ্গে বিশাল একটা চার্চ, তাজমহল, আর দক্ষিণের কোনও মন্দির। সেই বায়োস্কপের বাস্ক (বাক্স) আর বায়োস্কোপওলার মুখ আজও স্পষ্ট মনে আছে।

আর একবার শুনেছিলুম মেলার দোকানদারেরা এ মেলা থেকে সে মেলা ঘুরে বেড়ায় বিক্রির জিনিসটুকু পোঁটলা বেঁধে। বর্ষায় যখন মেলা থাকে না ওরা বাড়ি ফেরে। যাবার আগে বাড়ির সবার জন্য গস্ত করে। সে সব শুনে খুব ইচ্ছে হয়েছিলো বড় হয়ে মেলার দোকানদার হবো। এ মেলা সে মেলা রঙিন হাওয়া মোরগ বিক্রি করব। আর একটা টিনের বাক্সে বায়োস্কোপ দেখাবে এমন লোককে বিয়ে করব।

বেশ বড় বয়েস অব্দি আমার মেলার আকর্ষণ ছিলো খুব। শ্রীরামপুরে মামারবাড়ি গিয়ে মাহেশের মেলায় যেতুম। আর ক্ষেত্র সাহা স্ট্রিটে ইয়া বড়বড় মাটির পুতুল দেখে সারারাত সেই সব পুতুলের স্বপ্ন দেখতুম। একটু বড় হয়ে আগলা পাগলা জীবন কাটাবো বলে কত মেলায় গেছি। কিন্তু বয়স যত বাড়ছিলো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম মেলাগুলো কেমন বদলে যাচ্ছে। গাঁয়ের মেলাগুলো রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতা পেতে পেতে আমাদের মতো চরিত্র হারাচ্ছে। এ যেন শহুরে জীবনের তাঁবেদারি। নিজেও কবে থিতু হতে গিয়ে হারিয়ে ফেললাম গাঁয়ের মেলাগুলো আমার জীবন থেকে।

তবে মেলারা আমার পিছু ছাড়েনা। এখন আমি যে বাড়িতে থাকি অর্থাৎ আমার শ্বশুরবাড়ি, সেই বাড়ির পুজোকে ঘিরে এই কলকাতা শহরেই এলাকা জুড়ে বিরাট মেলা বসে। এ মেলাকে গাঁয়ের দেখা মেলাগুলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলাতে পারবেন না। অনেক বেশি সিন্থেটিক। তবু এখনও মেলাটার একটা সারল্য আছে, প্রখ্যাত বুটিক, রাবার উডের ফার্নিচারের দোকান বা বিরাট ইলেক্ট্রিক নাগর দোলাও এটাকে ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের কার্নিভাল লুক দিতে পারেনি। আসলে জিন্স আর স্পেগেডি পরা গৃহবধূও যখন মেদিনীপুরের আচার আর কাঠের বেলনার দোকানের সামনে দাঁড়ায় বা মা চন্ডীর পুজো দিতে এসে চিনির গজা কেনে তখন মেলার সারল্য মৃদু হলেও ফুটে বেরোয়। তবুও সারসত্য এই যে মেলাগুলো চরিত্র হারিয়েছে। কাল তা বেশ বুঝতে পারলাম সিঙ্গুর মেলায় গিয়ে। আঠারো বছর বয়সী এই মেলায় সিঙ্গুরে নিয়মিত না থাকার জন্য বহু বহু বছর যাইনি। কাল গেছিলাম সেই হাওয়া মোরগ আর বায়োস্কোপওলার দেখা পাবো এই আশায়। ও হরি কোথায় কি। এ যে দেখি কড়া পাহারাওয়ালা সমেত প্রখ্যাত জুয়েলার্সের স্টল আর কিচেন চিমনি, ওয়াটার ফিল্টার আর মাইক্রোওয়েভ বিক্রেতা। কেমন মন খারাপ হয়ে গেলো। থিকথিকে গিজগিজে ভিড় মেলায় সারল্য কেমন উধাও। সিঙ্গুরের লোকেরাও আজকাল অনেক বদলে গেছে। খানিক শহুরে হয়েছে, জটিল হয়েছে, কথার মধ্যে আঞ্চলিক টানগুলো হারিয়ে গেছে। মূলত চাষী পরিবারগুলোর কথায় বাঁশির মতো সুর আছে ও অঞ্চলে। বড় মিঠে সেই সুর। "কমনে গেইলে গো? মেলা দেখবেনি"। আজকাল সেসব সুর পরিত্যাগ করেছে বেশিরভাগ জন। তবু সিঙ্গুর মানে তো কেবল সিঙ্গুর গঞ্জটুকু নয়। বিরাট ব্লক আর থানার অন্তর্গত অনেকগুলো গ্রাম। তারা অনেকেই সেই সব মিঠে বুলি নিয়ে এসেছিলো সিঙ্গুর মেলা দেখতে। হিন্দু মুসলমান সমান রেশিওতে। হঠাৎ দেখলাম সাদাসিধে করে কমলা শাড়ি পরা মধ্যবয়সী মা, সস্তার চামড়ার জ্যাকেট পরা কালো ছেলে, পাট ভাঙা ছাপা শাড়ি পরা ছেলের বউ আর ফ্লুরোসেন্ট গোলাপি মাংকি টুপি পরা দুই নাতি নাতনি সমেত একটি পরিবার পরস্পরের হাত ধরে মুখে একরাশ ভয় নিয়ে মেলায় হাঁটছে। স্বেচ্ছা সেবক এসে ধমক দেয় তাদের হাত ছেড়ে হাঁটো, এই ভিড়ে রাস্তা জুড়ে চলেছো। ভয়ে ছেলেটি হাত ছেড়ে দেয় মধ্য বয়সী মায়ের। আর সেই মা তার সন্তানের উদ্দেশ্যে চিৎকার করছিলো "দাঁড়া নাগো, আমায় ফেলে পাইলে যাসনিস, কেমন ভয় নাগচে এতো লোক দেখে"। আমার ভারি মন খারাপ করছিলো, মনে হচ্ছিলো ওঁদের গ্রামে মেলা হলে কি এমন ভয় পেতেন উনি, আচ্ছা ওখানে মেলা সেই বায়োস্কোপওয়ালা যেত?কে জানে!

একটা টিনে ঘেরা পাম্প স্টোভে বসানো কড়াই, তার ভেতরের কালো হয়ে যাওয়া ফুটন্ত তেলে ময়দার গোলাগুলো ভেজে চিনির গুঁড়োতে ডুবিয়ে গরমাগরম আপনার হাতে দিচ্ছে। মাত্র দশটাকা। আপনার ব্রান্ডেড কেক খাওয়া শহুরে মুখ সে কেকের স্বাদ বুঝবে না।

একরাশ মন খারাপ নিয়ে মেলা থেকে বেরোনোর সময় গেটের মুখে দেখলাম চিনে বাদামওয়ালার বিরাট স্টল, চিনে বাদামের সঙ্গে ভুট্টাও ভাজছে আর বুড়ির চুল তৈরী করছে মেশিনে। লেখা আছে পপকর্ণ আন্ড ক্যান্ডি। হঠাৎ তার পাশেই মাইকে হাঁক শুনতে পেলাম মথুরা কেক, একবার খেলে বার বার খাবেন মথুরা কেক। মাত্র দশটাকায় মথুরা কেক। কৌতূহলবশত এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একজন নিবিষ্ট বিক্রেতা হাতে গরম কেক বিক্রি করছে। না কোনও উইপড ক্রিম মেই, সুগার কোটিং নেই, গ্রানুয়ুল্ড সুগার নেই, কেকের মধ্যে ডিজাইনও নেই এমন কি একখানা আভেনও নেই। ইস্ট মেশানো ময়দার লেচিতে কয়েকটুকরো কুঁচ ফল আর কাটা চেরি আর

একটা টিনে ঘেরা পাম্প স্টোভে বসানো কড়াই, তার ভেতরের কালো হয়ে যাওয়া ফুটন্ত তেলে ময়দার গোলাগুলো ভেজে চিনির গুঁড়োতে ডুবিয়ে গরমাগরম আপনার হাতে দিচ্ছে। মাত্র দশটাকা। আপনার ব্রান্ডেড কেক খাওয়া শহুরে মুখ সে কেকের স্বাদ বুঝবে না। মনে হবে পাঁউরুটিকে সস্তা তেলে ভেজে খাচ্ছেন বুঝি। কিন্তু বিশ্বাস করুন যখন দেখলাম সেই হাত ধরা পরিবারটির মুখে মথুরা কেক পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা অমলিন হাসি মন খারাপ এক্কেবারে উধাও হয়ে গেলো। বিক্রেতার আপত্তি স্বত্তেও খচাৎ করে ছবি তুলে নিয়েছি চোরা গোপ্তা। মথুরা কেক যেমন পেলাম একদিন সেই বায়োস্কোপওয়ালাকেও পাবো এই আশায়।।

খুচরো ডুয়ার্স

আমি আকাশে তুলিয়া ঠ্যাং
দেখেছি দেখেছি বৃহৎ ব্যাঙ
আমি তাহাকে মেরেছি ল্যাং
ওগো স্বদেশিনী।

বহু কষ্ট করিয়া কবিতাখানি রচিবার পর সম্পাদককে দেখাইতে তিনি কহিলেন, চলিবে না। এইসব লিখিয়া তুমি লিটারারি ফেস্ট-এ যাইবে, তাহা হইবে না। উহার বদলে পুরনির্বাচনের খবর লইয়া আসো। খবর ভাল হইলে ভাল মহাতামাক পাইবে। শুনিয়া চৈতন্যোদয় হইল। কোচরাজ্য আর বৈকুণ্ঠপুরে পুরনির্বাচনের হাল-হকিকৎ জানিবার তরে জনৈক গাঁয়ে মানেনা আপনি প্রধান গোছের এক ঘাসফুল নেতাকে কহিলাম, বৈকুণ্ঠপুর পুরসভা নাকি পদ্মফুল খাইয়া ফেলিবে? ইহা কি সত্য? নেতা লম্বা সিগারেট ধরাইয়া কহিল, কী বলিব কলম! আমার সিট এইবার মহিলা হইয়া গিয়াছে। আমার আর কাউন্সিলর হইবার আশা নাই।

আমি কহিলাম, তাহাতে কী হইল? বউকে দাঁড় করাইয়া দিবা। সে কহিল, গত বছর ডিভোর্স ফাইনাল হইয়া গিয়াছে। এখন আবার বিবাহ করিয়া বউকে দাঁড় করাইবার মত টাইম নাই। তবে মহফিল কুমারের ট্রাজেডি আরো গভীর।

শুনিলাম মহফিল কুমারের ওয়ার্ড সিডিউল কাস্ট মহিলা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মহফিল কুমার তো এসসি। তাঁহার বউ তো দাঁড়াইতেই পারে। তখন জানিলাম মহফিল কুমার জেনারেল কাস্ট বিবাহ করিয়াছে। ট্রাজেডির চূড়ান্ত। তবে শিবধনুকবাবু অবশ্য বেজায় খুশি। তাঁহার ওয়ার্ড বদলায় নাই। এই লইয়া ছয় বার তিনি দাঁড়াইবেন। তবে তিনি কোন ফুলে নাই। কিন্তু বৈকুণ্ঠপুরের ঘাসফুলপতি গোবর্ধনবাবু পস্ট বলিয়া দিয়াছেন যে বিরোধী দলের কে কোথায় দাঁড়াইবে, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইয়া লাভ নাই। পিকে কহিয়াছেন ঠগ-জোচ্চরকে টিকিট দেওয়া মানা। আমি তাহা অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিব। বিরোধিরা ইহা শুনিয়া বলিয়াছে, হায়! ঠগ বাছিতে বৈকুণ্ঠপুর উজার না হইয়া যায়।

কোচরাজ্যে পুষ্পকরথ নামা লইয়া প্রস্তর যুগ হইতে বিতন্ডা চলিতেছে। সবাই ভাবিয়াছিল শর্বরীবাবু অমাত্য পদ লাভ করিবার পর দিল্লী হইতে জাম্বো জেট নামাইবার অনুমতি লইয়া আসিবেন। কিন্তু সে গুড়ে চিরস্থায়ী বালি পড়িয়াছে। কোচরাজ্যে বড় জোড় ছোট পুষ্পকরথ নামিবে বলিয়া দিল্লী জানাইয়া দিয়াছে। পুররাজ অলংকারবাবুও যে সুখে আছেন, তাহা বলা যাইতেছে না। বৈকুণ্ঠপুরের সম্মোহনবাবুর ন্যায় তাঁহারও চাকুরি যাইবার সম্ভাবনা প্রবল। জিতিলেও নাকি যাইবে। তবে ইহা শুনা কথা। তবে অলংকারবাবুর না হয় মহাসূর্য আছে, সম্মোহনবাবুর কেহ নাই। বরং স্বদলের সমুদ্রপাড়বাবু তলে তলে নাকি পুররাজ হইবে বলিয়া কালীঘাট নিয়মিত পূজা দিতেছেন।

পদ্মফুলদের দেখিলাম লোকসভার ফল বিবেচনা করিয়া বৈকুণ্ঠপুরে ২৫-০ আর কোচরাজ্যে ২০-০ গোলে জিতিবে বলিয়া নিশ্চিন্তে চায় পে চর্চা করিতেছে। কাস্তে-হাতুড়ির সহিত হাত জোট বাঁধিয়া বৈকুণ্ঠপুরে ম্যাজিক দেখাইবার স্বপ্নে মশগুল। উহাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার ব্যাপারে দুইফুল সহমত।

পাঠক! সবুর করহ! শীত গিয়া বসন্ত আসিলে আরো আরো খবর দিব।

বাইসন্দেহ

রাখাল গরুর পাল লইয়া ফিরিতেছিলেন। গোমাতা-গোছানার দল হাঁটিতেছিল রাখালের পিছু পিছু। হেনকালে ঘাড় ঘুরাইয়া গোপালের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই রাখাল কিঞ্চিৎ নাকাল হইয়া পড়িলেন। একখানি গোছানাকে কেমন কেমন ঠেকিতেছে জানি! ভাল করিয়ে চাহিয়া দেখিতেই রাখাল বুঝিল, এ তো গরু গরু নয়, অগরু নিশ্চয়! বাছুরের দলে ভিড়িয়া দিব্যি হাঁটিতেছে একখানি ননগরু! ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ পূর্বক রাখালের মনে হইল ব্যাটা নির্ঘাৎ সম্বরের ছানা। কোন ফাঁকে জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া পথ হারাইয়া মিশিয়াছে বাছুরের দলে। তৎক্ষণাৎ অগরুটিকে গ্রেপ্তার করিল রাখাল। বাঁধিয়া হাজির হইল বনবিভাগের আপিসে। বনকর্তা লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, আরি বাপ! এ তো বাইসন কা সন। বাইসনকে মাই সন ভাবিয়া বেচারা গরুগুলি কিছু কয় নাই। তাহাদের মনে বারেকের জন্য সন্দেহ হয় নাই যে ব্যাটা বাইসন। যাহা হউক, বেচোরা বাইসন সন-কে বনবিভাগে জমা করিয়া রাখাল স্বস্তির শ্বাস ছাড়িয়াছে। নৈলে ছেলেধরা সন্দেহে বাইসনমাতা আসিয়া শিঙধোলাই দিতেই পারিত। মালবাজার ব্লকের কোথাও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া খবর আছে।

পুরো হিট

সরস্বতী পূজার দিন পুরুৎ মহাশয়রা ফুড়ুৎ করিয়া পালাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। রায় বাড়িতে পূজা সারিয়া খিড়কির দরজা দিয়া বোস বাড়িতে যাইতে গিয়া সরকার বাড়ির লোকজনের হাতে পড়িয়া পুরুৎ মশাই যখন হাত -পা ছুঁড়িয়া প্রতিবাদ জানাইতেছেন, তখন কর্মকার বাড়ির জিম করা ছেলে আসিয়া তাঁহাকে কোলে করিয়া গাড়িতে বসাইয়া হাওয়া! আরকজন স্বস্তিকা আবাসনে পূজা সারিবার পর ধুতি ত্যাগ করিয়া প্যান্ট পরিয়া ভাবিয়াছিলেন কেহ চিনিবে না, কিন্তু বাইক স্টার্ট করিতেই দেখিলেন সাত-আট জন বাইকধারী তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। সম্মুখেই শক্তিমান সঙ্ঘের পূজা। বেচারা পুরোহিত ভাবিয়াছিলেন সারদা আবাসনে যাইবেন। কিন্তু হইল কই? ময়নাগুড়িতে নাকি জনৈক পুরোহিত এক ডজন পূজা সারিবার পর ক্লান্ত হইয়া হোটেলে ঢুকিয়া অপেক্ষমান আরো ডজনখানেক পুরোহিতধরা-কে দেখাইয়া দেখাইয়া মাংস ভাত খাইয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহাকে আর কেহ নিয়োগ করিতে ভরসা পায় নাই। ডুয়ার্সে এইসব দেখিয়া ভাবিলাম, পুরোহিতই যদি বাড়ন্ত হয় তবে হিন্দুরাষ্ট্র হইবে কী ভাবে? লক্ষ্মী এবং সরস্বতী পূজার দিন পুরোহিতরাই হিট। তাই দুই বোনের পূজার দিন সিভিক পুরোহিত নিয়োগ করিবার কথা নাকি বিজেপি ক্ষমতায় আসিলে ভাবিবে।

হাতিবৈদান্তিক

নাগ্রাকাটার কোথায় জানি সপ্তাহ ভ'র যজ্ঞ হইতেছে। সেইখানে নাকি লোকালয়ে লোকাল হাতিরা ফাসিস্ত কায়দায় হামলা চালাইতেছে। হাতিদের জব্দ করিবার জন্য যজ্ঞের আয়োজন। গুরুজনদের মুখে শুনিয়াছি যজ্ঞ বৈদান্তিক মতে করিতে হয়। ইহাতে দেবতা খুশি হইয়া গেরস্তের সঙ্কট কাটাইয়া দেন। তান্ত্রিকগণ অবশ্য যজ্ঞ করিয়া প্রেমিকাকে বশীভূত করিবার কথা বলেন। চাকরিও নাকি মিলে। তা দেবতা হইল, প্রেমিকা হইল, চাকরি হইল— কিন্তু হাতি কী রূপে যজ্ঞ দ্বারা বশীভূত হইয়া সুবোধ গরুর মত লোকালয়ে আসিয়া দুটি ঘাস খাইয়া চলিয়া যাইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম না। ভাবিয়া দেখিয়াছি হাতিমাত্রেই নাস্তিক। ডুয়ার্সে যতগুলি হাতির ইশকুল আছে, কোথাও যজ্ঞ করিয়া হাতিকে বশ করিবার কথা সিলেবাসে নাই। তাহলে? বুঝিতে না পারিয়া কবিশিরোমণি পুরন্দর ভাটকে জিগ্যেস করিলাম। তিনি হোয়াটস আপে একখানি কবিতা পাঠাইলেন। উহা এই রকম— 'যজ্ঞতে ঠেকিবে হাতি/ এই ছিল সাধ/ হায় হাতি খেতে আসে/ যজ্ঞের প্রসাদ।' ঠিক। হাতিকে বৈদান্তিক মতে দীক্ষা না দিলে সে যজ্ঞ মানিবে কেন?

বিবাহট্টগোল

বর তাঁহার প্রিয় বন্ধুকে বলিয়াছিল, তুই না থাকিলে আমার বিয়ে জমিবে না। তোকে যাইতেই হইবে। পাত্রীর বাড়ি তিনখানি গ্রাম পরে ফালাকাটার নিকট। সেই গ্রামে বন্ধুর আত্মীয় পরিজন বসত করে। বন্ধু বলিয়াছিল, চিন্তা করিস না। আমি আগের দিন চলিয়া যাইব। সাগাই বাড়ি হইতে খুব সাজিয়া-গুজিয়া চলিয়া যাইব তোর শ্বশুর বাড়ি। বিবাহের দিন ঢাক-ঢোল বাজাইয়া, আলো জ্বালিয়া, বাজি পোড়াইয়া বরকে বরণ করিবার কথা। বরযাত্রী লইয়া বর আসিয়া দেখে সব ভোঁ ভোঁ। কেহ কোথাও নাই। বধূর বাড়িতে আসিয়া দেখে আলো জ্বলিতেছে বটে, কিন্তু সব জানি কেমন শূন্য শূন্য। তাহার পর শুনা গেল ভয়ানক সংবাদ। ভাবী বউ ভ্যানিশ। বিকাল অবধি সে হস্তে মেহেন্দি মাখিয়া সখীদের সহিত জমাইয়া গল্প করিতেছিল বটে কিন্তু তাঁহার পর অদৃশ্য। বর ঘাবড়াইয়া প্রিয় বন্ধুকে ফোন করিতে গিয়া দেখে একখানি হোয়াটস আপ আসিয়াছে। বন্ধু লিখিয়াছে, পাত্রী আমার সহিত ভাগিয়াছে। সরি। ইহার পর কী হইয়াছে জানি না। খুচরা লেখকের অত খবরে কাজ নাই।

অতঃপর পুরন্দর ভাট প্রেরিত গুটিকয় কাপলেট তুলিয়া দিব।

১) আধার করিতে গিয়া পাব্লিকের ক্রোধ/ মালবাজারে করে তাঁরা পথ অবরোধ।

২) সাহুডাঙি বাসিন্দা এক গয়লার/ বাড়ি এসে চিতা খেয়ে গেছে ব্রয়লার।

৩) শালবাড়ি শিক্ষকের এটিএম পিন/ জেনে নিয়ে ছাত্র করে একাউন্ট ক্ষীণ।

৪) দিনহাটায় আসিলেন নতুন জামাই/ মিষ্টি কিনে ঘুরে দেখে বাইকটি নাই।

৫) বাগ্দেবী দিবসেতে গোলাপের দাম/ শুনিয়া প্রেমিক কহে, জ্ঞান হারালাম!

কলম সিং

ধারাবাহিক প্রতিবেদন। তৃতীয় অধ্যায়। ২য় ভাগ

সার্জন রেনী'র 'ডুয়ার্স যুদ্ধের ডায়েরি'

ইঙ্গ-ভুটান যুদ্ধের ঐতিহাসিক লিপি

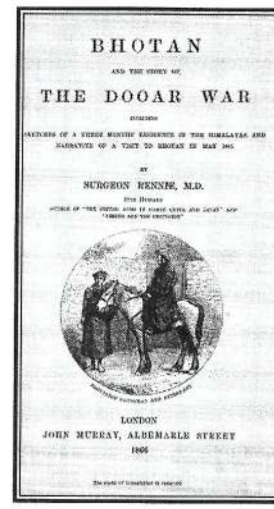

উমেশ শর্মা

পুনাখার পরিবেশ ও পরিস্থিতি ঃ

মি. ইডেন পুনাখায় পৌঁছেছিলেন ১৮৬৪ সালের ১৫ই মার্চ। তাঁকে ভুটান সরকার মোটেই ভালভাবে স্বাগত জানায়নি। এমনকি ১৭ই মার্চ তিনি সংসদে আহত হলেও, পথে তাঁকে পাথর ও কাঠের টুকরো ছুঁড়ে জনতা ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। তাসিশু জঙ-এর জুঙপেন, পুনাখার জুঙপেন, দেবরাজার দেওয়ান, দেবরাজার প্রতিনিধি, টংসোর পেনলো তাঁর সাথে মিলিত হয়েছিলেন। আঙদু ফোরাঙ দুর্গের অধিপতি এবং কুমকুলিং অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি ছিলেন অনুপস্থিত।

আলাপ আলোচনার পর উভয় সরকারের মধ্যে একটা চুক্তির বিষয়ে সহমত প্রকাশ করা হলে, মি. ইডেন ওই চুক্তির খসড়া তৈরি করেন। ১৮ ও ১৯শে মার্চ ওই খসড়া নিয়ে সংসদে আলোচনা করতে গিয়ে কিছু বিতর্ক উঠে আসে। পুনাখায় ব্রিটিশ এজেন্ট নিয়োগ ও উভয় দেশের মধ্যে করমুক্ত বাণিজ্য বিষয়ে আপত্তি তোলা হয়। মি. ইডেন বারবার দেবরাজা ও ধর্মরাজার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও সংসদ সেটি বাতিল করে দেয়। প্রাসাদের সামনে খোলা জায়গায় ওই বৈঠক হয়েছিল। প্রখর রৌদ্রতাপে প্রতিনিধিদল কষ্টই পেয়েছিল।

মি. ইডেনকে অবশেষে দেবরাজার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। মাঠের মধ্যে খোলা জায়গায় প্রথমে দেবরাজার সাথে এবং পরে অন্য একটি তাঁবুতে গিয়ে মি. ইডেন ধর্মরাজার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ধর্মরাজার বয়স বছর আঠারোর মত। দেখা হল নামমাত্র। টংসোর পেনলো জানিয়েছিলেন যে, তিনি উভয়ের প্রতিনিধি হয়ে মিশনের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। সংসদের সদস্যগণ প্রাসাদে বিশ্রামে গেলেও মিশনের সদস্যদের খোলা জায়গাতেই তাঁদের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

এক ঘণ্টা পরে মন্ত্রীসভার সদস্যদের সাথে চুক্তির প্রতিটি ধারা নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব আসে। আলোচনা শুরু হলে ভুটানের প্রতিনিধি হিসেবে টংসোর পেনলো প্রতিটি ধারাই ভুটানের অনুকুলে পুনরায় লেখার জন্য চাপ দিতে থাকেন। তাঁর কথা না মানায় তিনি উগ্রমূর্তি ধারণ করেন। তাঁকে বোঝানোর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পেনলো রেগে গিয়ে খসড়া চুক্তির কাগজপত্র দুমড়ে মুচড়ে বলেন, তাহলে যুদ্ধই হোক।

মি. ইডেন তাঁর কষ্টকর অভিযানটিকে ব্যর্থ হতে দিতে রাজি ছিলেন না। অনেক অনুরোধ করে তিনি যুদ্ধের বিপক্ষে বললেও, ব্যর্থ হয়ে পুনাখা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন।

মি. ইডেন পুনাখা ছেড়ে চলে যাবেন, এ কথা চরের মুখে শুনে ভুটানের সংসদ মি. ইডেনকে আরও দু'একদিন থেকে যাবার জন্য দূত পাঠান। কেউ কেউ বলেন যে, টংসোর পেনলোর কথায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অনুচিত। কারণ, সত্যিকারে তিনি সব কথা বলার অধিকারিই নন। তারা সকলে চুক্তির খসড়া নিয়ে পুনরায় আলোচনা করতে রাজি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে সমস্যা সমাধানে উৎসাহী।

মি. ইডেন ওই প্রস্তাবে রাজি হন এবং একই সঙ্গে ভারত সরকারকে ঘটনাবলী জানান। ২২শে মার্চ ভুটানের সংসদ থেকে জনানো হয় যে, মি. ইডেন যেভাবে খসড়াটি করেছেন, সরকার তা মেনে নেবে। সভার সভাপতি কিন্তু সেই টংসোর পেনলোই। আবার বৈঠক হল। এটাও জানা গেল যে, তাসিশু জুঙপেন হলেন তাঁরই জামাতা। চুক্তির খসড়া প্রস্তাব পাশ হলে, তা অনুবাদের দায়িত্ব প্রদান করা হল মি. ইডেনকেই। ২৪শে মার্চ চুক্তির খসড়াটির অনুবাদের কাজও সুসম্পন্ন হল।

মিশনের তাঁবু যেখানে টাঙানো হয়েছিল, পাশেই ছিল নদী। নদীর অপর পারে এবার সাংসদদের তাঁবুতে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেও মিশনের প্রতি কোনও সৌজন্য দেখানো হয়নি।

এই সভাতেও আবার চুক্তির ধারা নিয়ে একটার পর একটা আপত্তি তোলা হতে লাগল। মি. ইডেন ভেবেছিলেন, সেদিন শুধু সহি সম্পাদন করা হবে। কিন্তু একটা বিষয়ের পুনরাবৃত্তিতে তিনি অত্যন্ত বিব্রত ও অপমানিত বোধ করতে লাগলেন। উল্টে আঙদু ফোরঙের জুঙপেন মিশনের সদস্যদের পান খাওয়ানোর জন্য জোরজবরদস্তি করতে লাগলেন। ডা. সিম্পসনের গালে একটা গোটা পানপাতা সাঁটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আরও চূড়ান্ত অপমানের ভয়ে মি. ইডেন দার্জিলিং-এ ফিরে যাওয়াটাকে শ্রেয় মনে করতে লাগলেন।

২৫শে মার্চ ভোরবেলা জুম কুলিং ইডেনের সঙ্গে দেখা করতে এলে, তাসিশু জঙয়ের জুঙপেন আরও একপ্রস্থ অপমানজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলেন। জুঙপেন ভদ্রলোক মিশনের দোভাষী ছেবু লামাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে অসম-ডুয়ার্সের রাজস্ব বাবদ প্রতিবছর তিন লক্ষ টাকা দেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। মি. ইডেন ওই প্রস্তাবে রাজি হননি। কিন্তু টংসোর পেনলো এরকম চুক্তি করে সই করতে চাপ দিতে থাকেন। মি. ইডেন তাঁকে জানাল যে, ওই ধরনের শর্ত মানতে পারেন ভারত সরকার, তিনি সই করলেও সেটির মূল্য থাকবে না। ওই কথা বলায় মিশনকে প্রচণ্ড গালিগালাজ করা শুরু হল। প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হতে লাগল।

প্রচণ্ড রোদ সহ্য করতে না পেরে মি. ইডেনের জ্বর আসে। তবুও সন্ধেবেলা ছেবু লামাসহ মিশনের সবাইকে নিয়ে আবার আলোচনায় বসলেন তিনি। তিনি জানালেন, হয় পেনলোর কথামতো চুক্তি সই করতে হবে, নতুবা আজ রাতেই তাঁরা ফিরে যাবার উদ্যোগ নেবেন। তাছাড়া ছেবু লামা ও মি. ইডেনকে যেভাবে বন্দি করে রাখার হুমকি দেওয়া হচ্ছিল, তা হলে ভারত সরকার তাদেরকে উদ্ধারের জন্য সেনা পাঠাবে। এদিকে সামনে বর্ষা ঋতু। ম্যালেরিয়া প্রবণ, নদী-ঝর্ণা-অরণ্য সংকুল এ জনপদ অগম্য হয়ে উঠবে। যদি মি. ইডেন স্বাক্ষর করেন, তারপরে যদি ব্রিটিশ সরকারের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য জামিনদার হিসেবে তাঁদের দু'জনকে বন্দি করেও রাখেন, তবে বিষয়টি জটিল হবে।

রাতেই ওই স্থান ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেও মি. ইডেন শেষ চেষ্টা চালানোর চেষ্টা ছাড়েননি। তিনি ছেবু লামাকে ওদের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং প্রয়োজনে চুক্তিতে সই করতে বলেছিলেন। ছেবু লামা ওদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত ওদের শর্ত মেনে সই করে দিয়েছিলেন। এরপর ওরা মি. ইডেনকে সই করার জন্য চাপ সৃষ্টি করলে, তিনি জানিয়েছিলেন যে, তিনিও সই করবেন এবং সই করার পর ফিরে যাবেন।

পরের দিন সংশোধিত চুক্তিপত্র রচনা করে ওরা সেটি মি. ইডেনের কাছে নিয়ে আসেন। তবে, ওই নতুন চুক্তিপত্রে বহু বিতর্কিত বছরে তিন লাখ টাকা দেবার বিষয়টি আশ্চর্যজনকভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। নতুন চুক্তিপত্রে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা অভিযোগ করে নানা দাবি সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রথম খসড়াটির সঙ্গে এটির কোনও মিলই ছিল না। তিতিবিরক্ত হয়ে মি. ইডেন জানান যে, ওরা

যা খুশি তা লিখে যেন একটা চুক্তিপত্র তৈরি করে। সেটি তাঁর কাছে নিয়ে এলে তিনি সই করে দেবেন। কারণ, তিনি ফিরে যেতে চান।

মি. ইডেন ভুটানের আধিকারিকদের দেবার জন্য যে সব উপঢৌকন নিয়ে এসেছিলেন, টংসোর পেনলো ওই কল্পিত সামগ্রীর সঙ্গে অতি দীর্ঘ তালিকা জুড়ে, সেসব মি. ইডেনের নিকট থেকে আদায় করবার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে ওই উপঢৌকনগুলি তখনও পুনাখায় এসে পৌঁছায়নি। সে সব এলে মি. ইডেন সেগুলি দিয়ে দেবেন বলে কথা দেন। শেষ পর্যন্ত উপহারসামগ্রী পেলে ওরা আবার আলোচনায় বসতে আগ্রহী হন।

নির্ধারিত দিনে অদ্ভুত ও অর্থহীন চুক্তিপত্রটি সইসাবুদ করা হবে মনে করে মি. ইডেন কাউন্সিলের সামনে হাজির হয়েছিলেন। সংসদের সদস্যগণ সেদিন ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী। মিশনের সদস্যদের সেদিন চেয়ারে বসতে দেওয়া হয়েছিল। মাঙ্গলিক আচার অনুষ্ঠানও করা হয়েছিল। ২৯শে মার্চ। মি. ইডেন দেখলেন তিনপ্রস্থ একই চুক্তিপত্র কাগজে একটিতে ধর্মরাজার সইবিহীন অস্পষ্ট সীলমোহর এবং আরও একটিতে দেবরাজার সই ছাড়া অস্পষ্ট সীলমোহর দেওয়া হয়েছে। ওই দুই প্রস্থ কাগজে মি. ইডেনকে সই করতে বলা হল এবং ছেবু লামাকে সই করতে বলা হল। মি. ইডেন 'আন্ডার কম্পালসন' (বাধ্য হয়ে) কথাটি উপরে লিখে সই করে দিয়েছিলেন। তৃতীয় এক প্রস্থ কাগজে টংসোর পেনলো সই করে মি. ইডেনকে সই করতে বলা হলে মি. ইডেন তাতে সই করতে আপত্তি জানিয়েছিলেন।

মি. ইডেনকে এরপর ধর্মরাজা ও দেবরাজার সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাঁরা ভারতের গভর্নর জেনারেলকে উদ্দেশ করে লেখা একটি পত্র মি. ইডেনকে দিয়ে উপহারস্বরূপ তিনটি টাট্টু ঘোড়া ও কিছু রেশমি কাপড়ের টুকরো দিয়েছিলেন। মি. ইডেন উভয়ের কাছে সভাকক্ষ ত্যাগ করার অনুমতি নেন।

পুনাখা ত্যাগ

মি. ইডেন সংসদের সভাকক্ষ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে টংসোর পেনলো একটা টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে সদলবলে টংসো অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। তিনি নিজের দুর্গে ফিরে যাবেন। মি. ইডেন তাঁবু গোটাতে শুরু করলে একদল সিপাহী এসে জানিয়েছিল যে, আঙডু ফোরাঙ-এর জুঙপেন নিজের দুর্গ থেকে যতক্ষণ এখানে না আসছেন, ততক্ষণ মিশন পুনাখা ত্যাগ করতে পারবে না। ইডেন সাহেব কিন্তু এক মুহূর্তও সেখানে থাকতে রাজি ছিলেন না। ওই অবস্থায় ছেবু লামা সোজা দুর্গের ভিতরে গিয়ে সাংসদদের জানালেন যে, অসুস্থ সাহেবকে অন্যায়ভাবে দেরি করালে ফলাফল ভাল নাও হতে পারে। ওই চাপে কাজ হল। এক সাংসদ ইডেন সাহেবকে পুনাখা ত্যাগের অনুমতি দিলেন।

তবুও মাঝরাতে সাত-আটজন লোক সহ কয়েকজন আধিকারিক আঙডু ফোরাঙ-এর জুঙপেন না আসা পর্যন্ত ইডেন সাহেবকে অপেক্ষা করতে বলল। মি. ইডেন অপেক্ষা করতে রাজি না হওয়ায়, তারা জানিয়েছিলেন যে, ঘণ্টা ছয়েকের মধ্যে উনি অবশ্যই আসবেন। তাই, ইডেন সাহেব যদি সকালে রওনা দেন, তাহলে হয়তো পথে দেখা হলেও হতে পারে।

মিশন রওয়ানা দিলে ৩০ মার্চ সকাল এগারটা নাগাদ একজন সংবাদবাহক মিশনের পথ রোধ করে জানালেন যে, যদি মিশনটি পুনাখায় ফিরে না যায়, তবে ক্রুদ্ধ জুঙপেন মিশনের সঙ্গে কথা বলবেন না। আর এভাবে চলে যাওয়ার ফল ভোগ করতে হবে মিশনকে। ওই আধিকারিকেরা বিশেষত ছেবু লামাকে চলে যেতে দিতে কিছুতেই রাজি ছিলেন না। ইডেন সাহেব এবার হুমকি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। হুমকিতে কাজ হয়েছিল। ওরা কিছু উপহার পেয়ে সানন্দে মিশনকে পারো যাবার অনুমতি দিয়ে শুভকামনা জানিয়েছিলেন।

সেদিন রাতে একজন জিনকাফ এসে ছেবু লামাকে বন্দি করবার চেষ্টা করেছিল। তার হাতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও ছিল। কিন্তু মি. ইডেনের ধমকে ওরা নিবৃত্ত হতে বাধ্য হয়েছিল।

মিশন শীতল চন্দ্রলোকে তাদের যাত্রা অব্যাহত রেখেছিল। এভাবে তাঁরা পারোর পেনলোর এলাকায় এসে পৌঁছেছিল। সেদিন ছিল ৩১শে মার্চ। পরদিন সকালে তাঁরা পারোতে এসে পৌঁছালে, পারোর পেনলো বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি মিশনের নির্বিঘ্নে ফিরে আসায় খুশি হয়েছিলেন। ইডেনের মনে হয়েছিল, ভদ্রলোকটি দূরদর্শী একজন বৃদ্ধ মানুষ।

মিশন পারো ত্যাগ করেছিল ২রা এপ্রিল। এবার আবারও সেই ভয়ঙ্কর তাইগোন-লা গিরিপথ পেরোতে হবে। ওই সেই ভয়ঙ্কর বরফ ঢাকা পথ যেখানে সেবার ৪/৫ ফুট বরফ ছিল। এবার অবশ্য বরফ কিছুটা গলে গিয়েছে।

ইতিমধ্যে পারোর পেনলোর এক দূত এসে খবর দিয়েছিল যে, মিশনটি পুনাখা ত্যাগ করার পর সেখানে কিছু বিদ্রোহাত্মক ঘটনা ঘটেছে এবং কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তনও ঘটেছে। অবশ্য মিশন ওই সব কথায় আর কোনও গুরুত্ব না দিয়ে ক্রমে ক্রমে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ২১শে এপ্রিল দার্জিলিং-এ এসে পৌঁছেছিল।

প্রতিক্রিয়া, বন্ধুত্বের অবসান

মি. অ্যাসলে ইডেনের আপাত ব্যর্থতায় ভারত-ভুটানের বন্ধুত্বের সম্পর্কের অবসান ঘটেছিল। কখনও মনে হয়েছিল যে, ভুটানে একই সঙ্গে একদল সেনা পাঠানোর প্রয়োজন ছিল। কখনও মনে হয়েছিল, মিশন যে পথে দার্জিলিং থেকে ভুটানে গিয়েছিল, সেটি সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল না। ফিরে আসার পর মিশনের মনে হয়েছে যে, দার্জিলিং-এ সেনা নিবাস না গড়ে জলপাইগুড়িতে সেনানিবাস গড়াটা বেশি সুবিধাজনক। কারণ, ব্রিটিশদের সীমান্ত চৌকিগুলি বেশিরভাগই সমতলেই। ডালিমকোট দুর্গের নিচেই অম্বইক। সেখানেও সৈন্য ঘাঁটি হতে পারে। ওই সব জায়গা থেকে যাতায়াতের সুবিধা হবে, কুলির সমস্যা মিটবে এবং যানবাহনেরও বেশি সুবিধা পাওয়া যাবে। এসব বিষয় অঙ্ক কষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

ভারতের গভর্নর জেনারেল স্যার উইলিয়াম ড্যানিসন (কার্যনির্বাহী) দ্বিতীয়বার মিশন পাঠানোর কথা ভাবলেও গভর্নর জেনারেল স্যার জন লরেন্স ওই চিন্তাকে সমর্থন করেননি। পরবর্তী গভর্নর জেনারেল ১৮৬৪ সালের ১লা জুন তো সচিবকে জানিয়েই বসেছিলেন যে, যতগুলো লোক নিয়ে মি. ইডেন ভুটানে গিয়েছিলেন, ততগুলো সৈন্য নিয়ে সেখানে যাওয়া উচিত ছিল।

এভাবে মি. ইডেনের ব্যর্থতার নানা কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছিল ও ব্যাখ্যাও করা হয়েছিল। ভারত সরকারের কাউন্সিল মনে করেছিল যে পারো থেকেই মিশনের ফিরে আসা উচিত ছিল। পারোর পেনলোর বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের প্রশংসা করেছিলেন সবাই।

পুনাখায় মিশনের দু'জন হিন্দুস্তানি সদস্যকে টংসোর পেনলো লোভ দেখিয়ে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ওই দু'জনকে ফেরৎ আনতে পারেননি ইডেন সাহেব। সেটাই ছিল তাঁর প্রথম কাজ। যিনি ওই কাজকে গুরুত্ব না দিয়ে, পারোর পেনলোর সতর্কবাণীকে গুরুত্ব না দিয়ে চুক্তির খসড়া নিয়ে আলাপ আলোচনাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তিনি ভাল কাজ করেননি। মি. ইডেন দ্বিতীয় ভুলটি করেছিলেন, দুটি আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পরেও ওই স্থানে অলীক প্রত্যাশায় থেকে কালহরণ করা। নিজের খসড়া প্রস্তাবটি বাতিল হওয়ার পরে, ওদের অযৌক্তিক এবং মূল বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন ও ভুটানের স্বার্থপূর্ণ প্রস্তাব সমর্থন করে, সেটিকে রূপায়িত করবার জন্য অপেক্ষা করার কোনও দরকারই ছিল না।

মি. ইডেন যে শারীরিক মানসিক ও আর্থিক কষ্ট স্বীকার করেছেন, যে ভাবে পদে পদে অপমানিত হয়েছিলেন, তবুও ধৈর্য ধরে সংকল্পে অটুট ছিলেন, সেটা প্রশংসনীয়। কিন্তু, তিনি যে ভাবে 'আন্ডার কম্পালসান' লিখে চুক্তিপত্রে সই করেছিলেন, তা ঠিক করেননি। ওই কাজের একটাই সুফল হয়েছে যে, তিনি নিরাপদে মিশনকে দার্জিলিং-এ ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। অবশ্য ব্রিটিশ সরকারের সম্মান, মর্যাদা বজায় রেখে ফিরে আসতে পারেননি তিনি।

ইডেনের প্রস্তাব

২১শে এপ্রিল দার্জিলিং-এ ফিরে এসে পুনাখা সম্পর্কিত সমস্ত ঘটনা মি. ইডেন ভারত সরকারকে জানিয়েছিলেন। তারই প্রেক্ষিতে ৭ই মে তিনি নিম্নবর্ণিত কয়েকটি প্রস্তাব ভারত সরকারকে জানিয়েছিলেন। সেগুলি হল—

(১) সমগ্র ভুটানকে স্থায়ীভাবে অধিকার করা দরকার।

(২) ভুটানের সব দুর্গ গুঁড়িয়ে দিয়ে ওই সরকারের সৈন্যদের বিতাড়িত করা এবং ব্রিটিশ সেনা যে কতটা শক্তিমান, তা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন।

(৩) বাংলার অংশ ডুয়ার্স ও জল্পেশকে স্থায়ীভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা দরকার। মুসলিম রাজত্বে ওই জনপদ বাংলার অন্তর্গত ছিল এবং বিগত শতকে কিছু অংশ ব্রিটিশ শাসনাধীনে এনে ভুটানকে তা সমর্পন করা হয়েছিল।

মি. ইডেন জানান যে, ডুয়ার্সের উপরে দু'হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজার ফুট উচ্চতায় ভুটান পাহাড়ে ছোট ছোট অসংখ্য দুর্গে যে আধিকারিকরা থাকেন ও ডুয়ার্সে অবাধ লুন্ঠন চালান— তাদের ওই দুর্গগুলি ধ্বংস করে দিতে হবে। দার্জিলিং থেকে ডালিমকোটের পার্বত্য অঞ্চলকে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার পক্ষে জোরালো প্রস্তাব করেছিলেন তিনি।

সরকারি পদক্ষেপ

ব্রিটিশ সরকার কিন্তু ইডেনের প্রস্তাবগুলি তৎক্ষণাৎ কার্যকর করতে উৎসাহ দেখায়নি। তবে ভারত সরকার কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে ভুটানকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছিল। সেগুলি হল—

(১) আমবাড়ি-ফালকাটাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা ও অসম-ডুয়ার্সের রাজস্ব ভুটানকে প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ব্রিটিশ সরকার। ব্রিটিশ নাগরিকদের অপমান করার এটিই প্রতিফল।

(২) ভুটান সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, ওই সরকার যদি ভুটানে বন্দি ব্রিটিশ প্রজা ও কোচবিহার রাজ্যের প্রজাদের মুক্ত করে না দেয়, তাহলে ব্রিটিশ সরকার বেঙ্গল-ডুয়ার্সও দখল করে নেবে। একই সঙ্গে মি. ইডেন যে পার্বত্য অঞ্চলকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ওই প্রস্তাবও কার্যকর করা হবে।

ভুটান সরকারকে একটা নির্দিষ্ট সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। ওই সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে ব্রিটিশ সেনা ডালিমকোট, দেওয়ানগিরি, চামুর্চি, বাল্লা, বক্সা (পাশাখা) এবং বিষেণ সিং প্রভৃতি অঞ্চল দিয়ে ভুটানে প্রবেশ করবে। বাংলা ও অসমের আঠারটি দুয়ার ওই কাজে ব্যবহৃত হবে।

উল্লিখিত জনপদ (আমবাড়ি ফালাকাটা ও অন্যান্য) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করবার জন্য দশ হাজার সেনার সৈন্যদল গঠন করা প্রয়োজন। বাংলা, কোচবিহার ও অসম থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে চারটি সৈন্য ব্যূহ গঠন করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, প্রতিটি সৈন্য ব্যূহ স্বাধীনভাবে কার্যপ্রণালী রচনা করতে পারবে।

ছেবু লামা পত্র

ভুটান সরকার ভারত সরকারের চিঠি পেয়ে এবং যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে ডালিমকোটের জুঙপেনের মাধ্যমে ছেবু লামাকে একটি পত্র পাঠিয়েছিল। ওই পত্রটির মর্মার্থ নিম্নে বর্ণনা করা হল—

'ব্রিটিশরা জানিয়েছিল যে, তুমি ছিলে মিশনের ভাষা অনুবাদক। আমরা জানি না, তুমি আমাদের কথা কীভাবে মি. ইডেনকে জানিয়েছিলে এবং ইডেনও জানেন না আমরা কী বলেছি। কিন্তু তুমি তো জান চুক্তিটা স্বীকৃত হয়েছিল কি না, আমরা কোনও চাপ সৃষ্টি করিনি। যদি করতাম, তাহলে ওই সময়ে তা তোমার বলা উচিত ছিল। পরবর্তীকালে তুমি মি. ইডেনকে চলে যেতে দিয়ে এবং ভারতের গভর্নর জেনারেলকে মিথ্যে কথা বলে, ছলনা করবার সুযোগ করে দিয়েছিলে। তিনি তো ধর্মরাজকে লিখেছেন যে, আমরা ওই সময়ে উৎপীড়ণ করেছিলাম।

ভুটানের রীতি হল, একবার যে কথা দেওয়া হয়েছে, সেটা আর পাল্টানো হয় না। একবার যে দর কষাকষি হয়েছে, তা নিয়ে তো আর কোনও কথা হয় না। তাই আমরা দেবরাজাকে আর এ বিষয়ে নতুন কোনও কথা বলিনি। যদি গত বছরের চুক্তি কার্যকর না হয়, যদি পুনরায় কোনও যোগ্য প্রতিনিধি ভুটানে আসেন, অথবা এখান থেকে যদি কোনও প্রতিনিধি পাঠানো যায়, তবে তুমি তা লিখে জানাও। তাই তোমাকে আমরা এ চিঠি লিখে জানালাম। কিন্তু তা না করে যদি আক্রমণ করাটাকে যুক্তিযুক্ত বলে ভাবনায় থাক, তবে দু'পক্ষের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তুমিই হবে সম্পূর্ণরূপে দায়ী। আমরা কোনও কিছুই ফেরৎ দিতে রাজি নই।

সমতলভূমি এখনও অস্বাস্থ্যকর এবং এখন সেখানে সৈন্যদল পাঠানো যাবে না। যখন উপসর্গ থাকবে না, তখন সেনা পাঠাতে পারো। এখন ওই কাজ চুরি ডাকাতির সমপর্যায়ভুক্ত। কোচবিহার ও ভুটানের দোষ উভয়পক্ষেরই। তবুও ইংরেজ সরকার অসমের সীমান্তে আমাদের সাতটি তালুক দখল করে রেখেছে এবং কয়েক বছর ধরে আমবাড়ি ফালাকাটার রাজস্ব প্রদান বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে এ সবই তো যুদ্ধ ঘোষণার কারণ। অথচ ব্রিটিশ সরকার তা মিটিয়ে ফেলতে পারত। তাদেরকে যুদ্ধই করতে দাও। আমরা যদি প্রতিরোধ করতে পারি তো ভাল, না হলে আমরা নিষ্ক্রিয়ই থাকব।

প্রতিনিধি দলকে অপমানিত করবার কারণে গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, আমবাড়ি-ফালাকাটা ও অসম ডুয়ার্সের ভূ সম্পত্তির অধিকার বলে ভারত সরকার প্রতি বছর ভুটানকে যে পরিমাণ রাজস্ব দিয়ে থাকে, তা আর প্রদান করা হবে না। দীর্ঘদিন তাবেদারে থাকা ওই জনপদগুলি ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত করা হল। কিন্তু এভাবে খোলাখুলি বিভেদ এড়ানোর জন্য গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল দেবরাজা ও ধর্মরাজাকে উদ্দেশ করে একটা চিঠি পাঠিয়ে অনুরোধ করেছিল, যাতে ভুটানে যাদেরকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে বন্দি করে রাখা হয়েছে, তাদেরকে যেন মুক্তি দেওয়া হয় এবং যে সব সম্পত্তি গত পাঁচ বছরে লুণ্ঠিত হয়েছে, তা যেন ফেরৎ দেওয়া হয়।

তুমি হচ্চ বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী নাটরে গুরু। তুমি একজন সিকিমি, তাই তোমাকে আমরা কিছু বলতে চাই। তুমি এ কথাগুলো মনে রাখবে এবং তুমি তা তোমার ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে জানাবে। দ্যাখো, যদি ব্রিটিশ ও ধর্মরাজার মধ্যে কোনও বিভ্রান্তি না থেকে থাকে, তাহলে আমাদের তো আর কিছু বলার থাকে না। তুমি যদি শয়তানি কর, তাহলেও আমাদের কোনও কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।

এ সব বিষয় বিবেচনা করে তুমি তোমার উত্তর ডালিমকোটের জুঙপেনের মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দিও।'

এটা তো ঘটনা যে উভয়পক্ষই পরস্পরের ভূ-সম্পত্তি দখল করে রেখেছিল, এ কথার মধ্যে সত্যতা নিহিত ছিল ও আছে। কিন্তু চিঠিটিতে যেভাবে ঘটনাক্রম উল্লিখিত হয়েছিল, সেটির মধ্যে নিহিত ছিল চূড়ান্ত ভাবে সততার পরাকাষ্ঠা। চিঠির মধ্যে ছিল অভিযোগ ও অনুযোগ, স্বাভিমান এবং একই সাথে প্রভাবিত করবার প্রচেষ্টাও। ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের দীর্ঘদিনের বিবাদের চরিত্রটাও যেন ফুটে উঠেছে পত্রটির ছত্রে ছত্রে। (অথচ আশ্চর্য! রাজ এস্টেট বৈকুণ্ঠপুরেও একই সমস্যা থাকলেও, কোনও পক্ষই বৈকুণ্ঠপুরের সীমান্ত সম্পর্কে সামান্যতম শব্দও উচ্চারণ করেনি।)

সমরায়োজন

১৮৬৪ সালের নভেম্বরের গোড়ার দিকে বেঙ্গল-ডুয়ার্স ও সীমান্ত দুর্গগুলি অধিকারের জন্য যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ করা হয়েছিল। ভারতের গভর্নর জেনারেল নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্রটি জারি করেছিলেন—

'ফোর্ট উইলিয়াম, ১৪ই নভেম্বর, ১৮৬৪ ঘোষণাপত্র ঃ—

বহু বছর ধরে ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল ও সিকিম রাজ্যের এলাকার সঙ্গে ভুটানের প্রজাদের মধ্যে একটা বলপ্রয়োগের ঘটনা ঘটে চলেছে। অবাধ লুণ্ঠন, সম্পদ ও জীবনহানি, বলপূর্বক অপহরণ প্রভৃতি ঘটনা ঘটে চলেছে। অপহৃত বহু লোক এখনও ভুটানে বন্দি।

ব্রিটিশ সরকার তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে আন্তরিকভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। বিশেষত ১৭৭৪ সালের শান্তিচুক্তির প্রেক্ষিতে সরকার সময়ান্তরে ভুটান সরকারকে যেসব কাজ করতে উদ্যোগী করতে চেয়েছিল, সেগুলি হল— ওই সব অপরাধ সংঘটনকারীদের যেন শাস্তি প্রদান করা হয়। অবাধ লুণ্ঠন যেন বন্ধ করা হয় এবং অপহৃত লোকদের যেন মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু, সে সব প্রতিবাদের কোনও সুফল পাওয়া যায়নি। এমনকি কয়েকবার ভুটানকে তীব্রভাবে সতর্ক করে দেবার পরেও সুফল পাওয়া যায়নি। ব্রিটিশ সরকারকে হেঁয়ালিপূর্ণ কথা ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বারবার প্রতারিত করা হয়েছে। কিন্তু, কোনও সম্পদই উদ্ধার করা যায়নি। কোনও বন্দিরও মুক্তিলাভ ঘটেনি। কোনও অপরাধীরও শাস্তি হয়নি। উপরন্তু সীমান্তে উৎপাত বেড়েই চলেছে।

১৮৬৩ সালে ভারত সরকার তার নিজেদের প্রজাদের ধন-মান-সম্পত্তি রক্ষার জন্য ভুটানের রাজ দরবারে একটি প্রতিনিধিদলকে পাঠিয়েছিল। ওই দলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বন্ধুত্বপূর্ণ কিছু প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য, বন্দিদের প্রত্যর্পণের জন্য, অপহৃত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার জন্য এবং সীমান্তে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। ওই প্রস্তাবগুলি মানেনি ভুটানরাজ কর্তৃপক্ষ। অতীত ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তার বিষয়ে কোনও কর্ণপাত করেননি সরকার। প্রকাশ্য দরবারে ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের চরম হেনস্থা ও অপমান করা হয়েছিল। মিশনকে খালি হাতে ফিরে আসতে বাধ্য করা হয়েছিল। যে ধরনের নথিতে ভারত সরকারই একমাত্র তাৎক্ষণিকভাবে সহি সম্পাদন করতে পারে, ওই রকম একটি চুক্তিপত্রে জোর করে স্বাক্ষর করানো হয়েছিল।

প্রতিনিধি দলকে অপমানিত করবার কারণে গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, আমবাড়ি-ফালাকাটা ও অসম ডুয়ার্সের ভূসম্পত্তির অধিকার বলে ভারত সরকার প্রতি বছর ভুটানকে যে পরিমাণ রাজস্ব দিয়ে থাকে, তা আর

প্রদান করা হবে না। দীর্ঘদিন তাবেদারে থাকা ওই জনপদগুলি ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত করা হল। কিন্তু এভাবে খোলাখুলি বিভেদ এড়ানোর জন্য গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল দেবরাজা ও ধর্মরাজাকে উদ্দেশ করে একটা চিঠি পাঠিয়ে অনুরোধ করেছিল, যাতে ভুটানে যাদেরকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে বন্দি করে রাখা হয়েছে, তাদেরকে যেন মুক্তি দেওয়া হয় এবং যে সব সম্পত্তি গত পাঁচ বছরে লুণ্ঠিত হয়েছে, তা যেন ফেরৎ দেওয়া হয়।

ভুটানের জবাব

ওই দাবিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ভুটান সরকার কর্কশভাবে জবাব পাঠিয়েছিল। ভারত সরকারের তাই মনে হয়েছে যে, ওই স্থানগুলো দখল করা ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর নেই। সেটা করা হলেই সীমান্তের সুরক্ষা নিশ্চিত থাকবে নতুবা ভুটান সরকারের নিকট থেকে ভারত সরকার প্রতারিত হতেই থাকবে। ব্রিটিশ সরকারের প্রজাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতেই থাকবে।

সিদ্ধান্ত

তাই ভারত সরকারের গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভুটানের বেঙ্গল ডুয়ার্স, ডালিমকোট-বক্সা এবং দেওয়ানগিরির সন্নিকটস্থ পার্বত্য অঞ্চল চিরদিনের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এর ফলে দার্জিলিংয়ের পার্বত্য অঞ্চলে ও ডুয়ার্সের সমতলভু মিত ভুটানি অত্যাচার ও লুণ্ঠনের ঘটনা আর ঘটবে না। ওই কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সীমান্তে একদল সৈন্য মজুত করা হয়েছে। এই ঘোষণা জারি হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে সচেষ্ট হবে।

অভিযান চালানো স্থানগুলিতে সমস্ত আধিকারিকদের, জমিদারদের, গ্রামের মোড়লদের, কৃষিজীবী ও দেশবাসীকে শান্তভাবে নিজের বাড়িতে শান্ত থাকতে এবং ব্রিটিশ বাহিনীকেও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সহায়তা করতে নির্দেশ প্রদান করা হচ্ছে। যে বা যিনি প্রতিরোধ করবেন না, তার সমস্ত ভু-সম্পত্তি, সম্পদ ও প্রাণরক্ষার সম্পূর্ণ জামিনদার (গ্যারান্টার) হবে ভারত সরকার। একই সঙ্গে সকলকে ন্যায়বিচার প্রদান করা হবে। ভূসম্পত্তি জরিপ করে মূল্য নির্ধারণ করা হবে এবং সকল প্রকার অত্যাচার, অবিচার, জুলুম সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে।

ইংল্যান্ডের মহারানীর সাম্রাজ্য ও ভুটানরাজের সীমান্ত সীমানা জরিপ করে চিহ্নিত করা হবে এবং ভুটান সরকার তার স্থিরিকৃত সীমানায় চিরকালের জন্য সার্বভৌমকত্ব অর্জন করবেন।

সংসদের নির্দেশিকা

গভর্নর জেনারেলের সংসদ এই নির্দেশ জারি করেছে— ঘোষণা অনুসারে নিম্নবর্ণিতভাবে সৈন্যবাহিনী সাজানো হবে এবং যে সব জায়গা থেকে সৈন্য ব্যূহ সীমান্ত অতিক্রম করে এবং ডুয়ার্সের সমতলভূমি থেকে ভুটান দুর্গ অভিমুখে যাত্রা করে অভিযান শুরু করবে, তা উল্লেখ করা হল। সেনাবাহিনীর মহানির্দেশক হবেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুলকাস্টার। অসমের দিকে ডানদিক থেকে সৈন্য ব্যূহ নিয়ে এবং বামদিক থেকে সৈন্য ব্যূহ নিয়ে সেনা পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডানসফোর্ড সি.বি.।

দক্ষিণ সৈন্য ব্যূহ গৌহাটি থেকে দেওয়ানগিরি অভিমুখে যাত্রা করবে। ওই সৈন্যবাহিনীতে থাকবে— ইউরেশিয়ান (মধ্যপূর্ব) গোলন্দাজ বাহিনীর তিনটি মাউন্টেন ট্রেনগান। বাংলার পঞ্চম অশ্বারোহী বাহিনীর এক স্কোয়াড্রন সৈন্য, অসমের ৪৩ নং লঘু পদাতিক বাহিনী, এক কোম্পানি নির্মাণকর্মী ও মাইন বসানোর লোক। বাংলার ১২ নং রেজিমেন্টের দেশিয় পদাতিক বাহিনী এবং অসমের স্থানীয় গোলন্দাজবাহিনীও ওই দলে থাকবে। ওই বাহিনী গৌহাটি দখলের দায়িত্বে হবেন সহায়ক।

দক্ষিণের মধ্যভাগের সৈন্য ব্যূহ গোয়ালপাড়া থেকে বিষেণ সিং অভিমুখে যাত্রা করবে। ওই বাহিনীতে থাকবে— ইউরেশিয়ান গোলন্দাজ বাহিনীর গোলা নিক্ষেপকারী তিনটি পাহাড়ি বাহিনী। বাংলার পঞ্চম অশ্বারোহী বাহিনীর এক স্কোয়াড্রন সৈন্য। ১৪ নং বাংলার অশ্বারোহী দুই স্কোয়াড্রন সেনা। এক কোম্পানি নির্মাণকর্মী ও মাইন বসানোর লোক। ৪৪ নং দেশিয় পদাতিক বাহিনীর এক উইং সেনা। ১২ নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক উইং পদাতিক বাহিনী। ১২ নং দেশিয় পদাতিক বাহিনীর দুই কোম্পানি সৈন্য প্রয়োজনে সাহায্য করবার জন্য গোয়ালপাড়ায় থাকবে।

বাঁ দিকের মধ্যভাগে একটি সৈন্য ব্যূহ কোচবিহার থেকে বক্সা ও বল্লার দিকে অভিযান করবে। সে বাহিনীতে থাকবে— ৫ নং ব্যাটারি, ২৫ নং ব্রিগেড রয়্যাল গোলন্দাজ বাহিনীর আর্মস্ট্রং মাউন্টেন ট্রেন গানস। দুটি ৮ ইঞ্চি মর্টার (৬ নং ব্যাটারি, ২৫ নং ব্রিগেড রয়্যাল আর্টিলারি), এক কোম্পানি নির্মাণকর্মী ও মাইন পাতার লোক এবং তাদের সঙ্গে থাকবে নদী পারাপারের জন্য চ্যাপ্টা তলা বিশিষ্ট তিনটি নৌকা। ২ নং গোর্খা রেজিমেন্ট এবং ১১ নং দেশিয় পদাতিক বাহিনীর এক উইং সেনা।

বাঁ দিকের সৈন্য ব্যূহ জলপাইগুড়ি থেকে ডালিমকোট ও চামুর্চি অভিমুখে রওনা দেবে। ওই বাহিনীতে থাকবে— এক কোম্পানি নির্মাণকর্মী ও মাইন পাতার লোক। ১১ নং বাংলার দেশিয় পদাতিক বাহিনীর এক উইং সেনা। ১৮ নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের দেশিয় পদাতিক বাহিনীর একটি উইং, ৩০ নং পাঞ্জাবি পদাতিক বাহিনী। দুই স্কোয়াড্রন ৫ নং বাংলার অশ্বারোহী বাহিনী।

উল্লিখিত সৈন্যবাহিনী ছাড়াও তিন কোম্পানি রিজার্ভ বাহিনী থাকবে। ওই বাহিনীতে মহারানির ৪৮ নং এবং ৮০ নং রেজিমেন্ট এবং ১৭ নং দেশিয় পদাতিক বাহিনীর দুই কোম্পানি সেনা দার্জিলিং-এ মজুত থাকবে।

৪৮ নং মহারানি সৈন্যের দুটি কোম্পানি তুলে নিয়ে সেখানে ৮০ নং রেজিমেন্টের অতিরিক্ত দুই কোম্পানিও সেখানে মজুত থাকবে। ওই সৈন্য ব্যূহ শুধুমাত্র ইউরোপীয় পদাতিক বাহিনীর এবং বন্দুক ও মর্টার বাহিনীর সেনারাই থাকবে।

ভুটানের ধর্মরাজার পত্র

উপরিউক্ত ঘোষণা জারির পরিপ্রেক্ষিতে ভুটানের ধর্মরাজা ভারতের গভর্নর জেনারেলকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। চিঠিটির সাধারণ ভাবানুবাদ প্রদান করা হল—

'আপনি সর্বদা আনন্দে থাকুন এবং ঈশ্বর আপনার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বজায় রাখুন। গত ২১শে শ্রাবণ (জুলাই) আমি আপনার চিঠি পেয়েছি। সেটি ডালিমকোটের জুঙপেনের হাত দিয়ে আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল। ওই চিঠিতে বলা হয়েছে যে, আমার প্রজারা ব্রিটিশ প্রজাদের উপর জুলুম করেছে, ডাকাতি করেছে। তাই আপনি মি. ইডেনকে ওই সব ঘটনার তদন্ত করতে পাঠিয়েছিলেন। মি. ইডেন যখন আমার দরবারে হাজির হয়েছিলেন, আমি তখন সবেমাত্র ধর্মরাজা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলাম। তিনি যখন আমার এখানে এসেছিলেন, তখন আমি আমার সাংসদদের বলেছিলাম, দ্যাখো, ওই লোকগুলো বহু পথ ঘুরে, বহু পরিশ্রম করে, বহু দূর থেকে এখানে এসেছেন। ওঁরা ক্লান্ত। তাই তাঁদের মর্যাদাপূর্ণভাবে অভ্যর্থনা করবে এবং তাঁদের চাহিদামত জিনিসপত্র সরবরাহ করবে। মি. ইডেন বিশ্রাম লাভ করলে আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমি তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে, তিনি কী উদ্দেশ্যে আমার কাছে এসেছিলেন। তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন। 'ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় আপনার প্রজারা যে অত্যাচার, লুটপাট ও ডাকাতি করেই চলেছে, আমি ওই বিষয়গুলি তদন্ত করেত এসেছি।'

তাঁর কথা শুনে আমি আমার আধিকারিকদের যথাযথ নির্দেশ দিয়েছিলাম। আপনি লিখেছেন যে, আপনি ডুয়ার্স ও আমবাড়ি-ফালাকাটার রাজস্ব প্রদান বন্ধ করে দিয়েছেন। আমি যতদিন আপনার অভিযোগগুলির প্রেক্ষিতে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করি, ততদিন ওই রাজস্ব ফেরৎ দেবেন না। আপনি বলেছেন যে, টংসোর পেনলো সেবার মি. ইডেনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিলেন। সে কথা আমি সত্য বলে স্বীকার করছি। বর্তমানে টংসোর পেনলো তাঁর নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে ফিরে গিয়েছেন।

এখন সবকিছু স্থির করতে আপনি যদি চান, আপনি কিছু সরকারি আধিকারিককে পুনরায় আমার কাছে পাঠাতে পারেন। আমি কোনও বাধা দেব না। তবে এ মুহূর্তে এলে তাঁরা খুব কষ্টে পড়বেন। যদি তাঁরা সব কিছু মিটিয়ে ফেলতে এখানে আসেন, তাহলে তাঁদের সামনে সব কিছু বুঝিয়ে বলতে পারব। তাঁরাও সত্যটা বুঝতে পারবেন। যদি ওই আধিকারিকরা আসতে না পারেন, তাহলে শীতের শেষে আমি আমার সেক্রেটারিকে পাঠাতে পারি। আপনি সব বিষয়গুলি তদন্ত করতে চাইলে, আপনার পছন্দমতো যে কোনও জায়গায় আমি তাঁদেরকে পাঠাতে রাজি আছি। আপনি তখনই বুঝতে পারবেন, কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা। আর আপনি তখনই সঠিক ব্যবস্থাটি গ্রহণ করতে পারবেন।

আপনি লোক পাঠানো বা এ সম্পর্কিত বিষয়ে কোনও চিঠিপত্র পাঠানোর সময়ে অনুগ্রহ করে টংসোর পেনলোর দুর্গ দিয়ে পাঠাবেন না।

ভুটান দেশটির সর্বোচ্চ আধিকারিক হলেন ধর্মরাজা। আপনি যে রাজস্ব বলপূর্বক কেটে নিয়েছেন, তা আপনি আমাকে ফেরৎ দিতে পারেন। অবশ্য আপনার মন না চাইলে, তা না-ও পাঠাতে পারেন। প্রদান করা বা কেটে রাখার মালিক আপনি। কিন্তু আপনি আপনার শারীরিক সুস্থতার কুশল সংবাদ জানাতে ভুলবেন না।

(আগামী সংখ্যায়)

গান্ধীকে আজ অপহরণের চেষ্টা চলছে

দেবপ্রসাদ রায়

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও গান্ধী সমার্থক। যদিও গান্ধীর নেতৃত্বে মূলস্রোতের আন্দোলনের বাইরে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে অভ্যুত্থান হয়েছে, কিন্তু তা মূলস্রোতকে প্রভাবিত করতে পারে নি। স্বাধীনতার ৭২ বছর পরে আজকের প্রজন্ম যখন এ আন্দোলনকে এক অচেনা অধ্যায় বলে ভাবে, তখন তাকে পাশাপাশি এও বোঝাবার প্রয়াস হয়— এ দেশ ব্রিটিশের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয় নি— হাত পেতে নিয়েছে।

গান্ধীকে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে যেদিন ডাকছেন 'তুমি এসো', তখন তাঁকে ফোনিক্স-এর আশ্রমটা দেখতে হচ্ছে। তাঁকে সেখানে 'ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ান' পত্রিকাটা চালাতে হচ্ছে, তাঁকে সন্নিহিত আফ্রিকার দেশগুলির ভারতীয়দের উৎসাহিত করতে হচ্ছে, কাজেই তাঁর সিদ্ধান্ত নে'য়াটা সহজ ছিল না। অবশেষে, দ্বিতীয় পুত্র মনিলালের হাতে 'ফোনিক্স' ছেড়ে দিয়ে, ১৯১৪-র নভেম্বরে রওনা দিলেন ভারতের উদ্দেশে। ৯ই জানুয়ারি ১৯১৫ বম্বেতে এসে অবতীর্ণ হলেন, যার আগমন বার্তা ইতিমধ্যে ভারতে পৌঁছে গেছে। একটা মানুষ আসছে, গোখলের আহ্বানে, যিনি একটা অহিংস আন্দোলন করে দক্ষিণ আফ্রিকার বুকে ইতিহাস লিখে এসেছেন এবং সে আদতে গুজরাটি।

বম্বেতে ব্যবসা, বাণিজ্য, সংবাদপত্র গুজরাটিদের নিয়ন্ত্রণে, ভীষণভাবে সংবর্ধিত হলেন। ভীষণভাবে প্রশংসিত হলেন। তাঁর সংবর্ধনায় স্বাগত জানিয়ে চোস্ত ইংরিজিতে বক্তৃতা করলেন, মহম্মদ আলি জিন্না, যিনি ১৯০৬ সালেই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। গান্ধী জবাবে, উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত হাস্বল, নম্র ভাষায় গুজরাটিতে প্রত্যুত্তর দিয়ে সভার শেষে জিন্নাকে বললেন, "নিজের মাতৃভাষায় বক্তৃতা করতে শিখবেন না?" গান্ধী গোখলের দ্বারা পরামর্শ পেয়েছিলেন যে "দেশটা বৈচিত্র্যে যেমন অভিনব, সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে তেমনই কঠিনতম। আগে দেশটাকে চেনো। ভারত— তাঁকে বুঝে, চিনতে একমাত্র তুমিই পারবে, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী অথবা নর্থ ইস্ট ফ্রন্টইয়ার থেকে আসাম, একত্রিত করে লড়াই করতে তুমিই পারবে।"

১৯১৫ থেকে ১৯১৬-র মাঝামাঝি কেবল ঘুরেছেন, দেখেছেন হিন্দু আছে, মুসলিম আছে, পার্শি আছে, বৌদ্ধও আছে। কিন্তু আর একভাবে যদি এদের দেখা যায়, 'দারিদ্র' আর 'ধনিকশ্রেণি'। অবশ্যই ৮০ শতাংশ মানুষের— দেশের হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ঈশাই, বৌদ্ধ, পার্শি— দারিদ্রের ক্ষেত্রে এক জায়গায়। ছেড়ে দিলেন কোট, প্যান্ট, টাই। ওই পোশাকটা পড়লেন, যেটা ওদের পোশাক। এবং যেমন 'ফোনিক্স' দিয়ে শুরু করেছিলেন, তেমনই 'সাবরমতী' দিয়ে শুরু করলেন— আমেদাবাদে। ১২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে শুরু হল আশ্রমিক জীবন।

চারটি বার্তা নিয়ে ভারতে এসেছেন। চারটি অ্যাজেন্ডা নিয়ে এসেছেন। মাঝে মাঝে নিবিড়ভাবে ভ্রমণ করে বুঝতে পেরেছিলেন, চারটিকেই একসাথে হাতে নিতে হবে। একটি হ'ল 'রিম্যুভাল অফ আনটাচেবিলিটি' আর একটি হ'ল 'হিন্দু মুসলিম ঐক্য' আর একটি হ'ল 'স্বরাজ', আর একটি হ'ল 'স্বদেশী'। হিন্দু মুসলিম ঐক্যর জন্য তাঁর হাতিয়ার ছিল 'খিলাফত আন্দোলন', স্বদেশীর জন্য তাঁর হাতিয়ার ছিল 'চরকা', স্বরাজের জন্য তাঁর হাতিয়ার ছিল 'অহিংসা', অহিংসা-কে আবার চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের সামনে আনবার চেষ্টা করলেন। 'সত্যাগ্রহ', 'অসহযোগ', 'আইন অমান্য' পরিশেষে 'অনশন'।

গান্ধীজীর সাবরমতী আশ্রম শুরু করতে বা চালাতে কোনও কষ্ট হয়নি, কারণ গুজরাটের ধনিকশ্রেণিরা দু'হাতে সমর্থন বাড়িয়ে দিয়েছে। গান্ধীকে এখানেও একটা সাফল্যের ইতিহাস গড়তে হবে। কিন্তু তিনি তো 'অ্যাজেন্ডা' ছাড়তে পারেন না। তাই তিনি তাঁর আশ্রমে প্রথম একটি দলিত পরিবারকে নিয়ে এলেন। মা, বাবা, সন্তানসহ তারাও থাকতে শুরু করলেন। রক্ষণশীল গুজরাটিরা, যাঁদের অর্থানুকূল্যে এই আশ্রম চলছিল, তারা বললেন, "আর নয়। এবার তুমি তোমার মতো চালাও"। একটু তো সমস্যা হলোই। সেভাবে উনি তখনও তো 'গান্ধী' হয়ে ওঠেন নি। ভাবছেন কী হবে, আমার আশ্রমের। এ সময় একজন ভদ্রলোক, অবশ্যই— ধনবান ব্যক্তি, উনি গাড়ি করে এলেন, সাবরমতী আশ্রমের বাইরে। গেটের বাইরে থেকে একটি ছেলেকে ডেকে বললেন, "মোহনদাসকে ডাকতে পারবে?"

—"ডেকে দিচ্ছি"

গান্ধীজী এলেন।

ভদ্রলোক বললেন, "তোমার বাৎসরিক খরচ কত?"

বললেন, "ছয় হাজার টাকা"

"ঠিক আছে।"

উনি চলে গেলেন। পরের দিন এসে আবার একটি ছেলেকে বললেন, "একটু মোহনদাসকে ডাকো।"

গান্ধীজী এলেন।

ভদ্রলোক গাড়ির থেকে নামেন নি। গাড়ি থেকেই ১৩ হাজার টাকা দিয়ে বললেন, "দু-বছর চলবে তো?"

গান্ধী অন্ধকারে যেন একটা আলোকবর্তিকা দেখতে পেলেন, শুধু সমস্যার সমাধান নয়, তাঁর অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই এবার স্বীকৃতি পেল।

১৯১৬-র লখনউ কংগ্রেস। গেছেন গান্ধী। নতুন লোক। শুধু লোকে এইটুকু জানে, এই সেই লোকটি— কিছুদিন আগে মদনমোহন মালব্যের উদ্যোগে যে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির উদ্বোধন হচ্ছিল, সেখানে প্রধান অতিথি ভাইসরয়, মঞ্চে সমস্ত দেশীয় রাজারা বসে আছেন, এবং দ্বারভাঙার রাজা সভাপতিত্ব করছেন— তাঁকে যখন বলতে বলা হ'ল সেই পটভূমিকায়, সবাই যখন বলছে 'এটা একটা ঐতিহাসিক উদ্যোগ, এবং ভাইসরয়-এর উপস্থিতি একটা নতুন মাত্রা জুড়ে দিয়েছে', গান্ধী তখন তাঁর ভাষণে বললেন, "এখানে কি দরিদ্র ছাত্ররা পড়তে পারবে? এখানে কি দলিতরা পড়তে পারবে? এখানে কি নিঃশুল্ক পড়াশোনার ব্যবস্থা থাকবে?" সভার উদ্যোক্তা অ্যানি বেসান্ত পিছন থেকে এসে বললেন, "এবার থামো"। আর শ্রোতারা বলছেন "ব্র্যাভো, ব্র্যাভো, চালিয়ে যাও"। গান্ধী চালিয়ে গেলেন। ভাইসরয় মুখ লাল করে চলে গেলেন। দ্বারভাঙার রাজা বলছেন, "ইদার হি স্টপস অর আই কুইট", অ্যানি বেসান্ত অনেক অনুরোধ উপরোধ করে তাঁকে থামালেন। ভারতবর্ষে মোহনদাস করমচাঁদের এটাই প্রথম বক্তৃতা।

এই পটভূমিকায় লখনউ কংগ্রেস। তখন দেশের প্রথম সারির নেতা লালা রাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিন চন্দ্র পাল, মতিলাল নেহেরু। তাঁরা দেখছেন একটি সম্ভ্রান্ত কৃষক একজনের থেকে আরেকজনের কাছে বারবার যাচ্ছে আর অনুরোধ করছে। "না, না, না, তোমার এই সমস্যা অত্যন্ত স্থানীয় সমস্যা। আমরা অনেক বড়ো কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তোমাদের সমস্যাটা আমরা দেখতে পারবো না।" তাকে বললেন লোকমান্য তিলক। তারপরে একজন, (লালা লাজপত রায়) মোহনদাসকে দেখিয়ে বললেন, "ওকে বলে দেখতে পারো। নতুন এসেছেন। ওর উৎসাহ আছে। দেখো, যদি যায়।" লোকটি গান্ধীর কাছে এসে বলছে, "স্যার, আমার নাম রাজকুমার শুক্লা। দয়া করে একবার কেউ চম্পারনে এসে দেখুন, কী অত্যাচার নীলকর সাহেবদের! কী অমানুষিক জীবনযাত্রা আমাদের সহন করতে হচ্ছে! আমাদের একবার এসে দেখুন।" গান্ধীও একটু ইতস্তত করে বললেন যে, "এখন তো হবে না, দেখছি। নিশ্চয়ই মাথায় থাকলো।" তখন তো সব জায়গায় সরাসরি ট্রেন নেই। লখনউ থেকে আমেদাবাদ স্টেশনে নেমে রেলগাড়িতে তখন তিনি পরবর্তী জায়গা বম্বেতে যাচ্ছেন, স্টেশনে রাজকুমার শুক্লা, "আমি কথা না নিয়ে তো যাবো না।"

"তোমাকে তো বললাম, যাবো। আমি একটা অন্য প্রোগ্রামে যাচ্ছি।"

"না, ঠিক আছে।"

বম্বেতে নেমেছেন। নেমে দেখেন রাজকুমার শুক্লা।

"স্যার, কথা না নিয়ে আমি যেতে পারবো না। আমার গ্রামের অবস্থা এত খারাপ। আপনি "হ্যাঁ না বলা পর্যন্ত আমি যেতে পারবো না।"

"মহা মুস্কিল, বলেছি তো যাবো।"

গান্ধী তার মতো আবার আমেদাবাদ ফিরে সাবরমতী গেছেন। সাবরমতীর দরজায় রাজকুমার শুক্লা। তখন বললেন, "ঠিক আছে। ১৭তে কোলকাতা কংগ্রেস হবে। ওখান থেকে যাবো।" সে তাতেই খুশি। সে বলল, "ঠিক আছে।" এবং কোলকাতা কংগ্রেসের প্রথম দিন থেকেই রাজকুমার শুক্লা গান্ধীকে ছায়ামূর্তির মতো অনুসরণ করে যাচ্ছেন। গান্ধী বললেন, "যেতে তো হবেই, চলো।"

ততদিনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ শাসনে পরিণত হয়েছে— সিপাহি বিদ্রোহের পরে। রাজ্যে রাজ্যে গভর্নর নিযুক্ত হয়েছেন এবং বিহারের গভর্নর মতিহারির (চম্পারনের জেলা শহর) ম্যাজিস্ট্রেটকে বলে দিয়েছে "এই লোকটি ভয়ংকর। এর সম্পর্কে সতর্ক থাকো, প্রয়োজনে আগেই ব্যবস্থা নেবে।" উনি পৌঁছেছেন, নামার পরেই দুটি সিপাহি বলছে "আপনাকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আগে সেখানে যেতে বলেছেন।"

"চলো।" গেছেন। ম্যাজিস্ট্রেট বলছেন, "আমার উপর তো নির্দেশ আছে আপনাকে ফিরে যেতে বলা।" —"কিন্তু আমার উপর তো নির্দেশ আছে, এখানে থাকার। আমি যদি ফিরে না যাই, তাহলে কী হবে?"

"আইন আইনের পথে চলবে। আপনি গ্রেফতার হবেন।"

"তাই? তাহলে গ্রেফতার করুন। আমি তো সেই জন্যেই এসেছি।"

জেলাশাসক একটু বিস্মিত হলেন। এতো অন্য ধরনের মানুষ। আর ইংরিজিতে কথাবার্তা বলছে, সড়গড়।

—"আচ্ছা, আপনি কী চান, বলুন তো?"

—"আমি কোনও আন্দোলন করতে আসিনি। কিছু চাইতেও আসি নি। একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি।"

—"বলুন"

"আপনি দয়া করে আপনার লোক দিয়েই একটা কমিশন গঠন করুন। আমি তাতে মেম্বার থাকব। একটু চম্পারনের গ্রামগুলো ঘুরবো। সেই মানুষগুলোকে দেখব যাদের জন্য রাজকুমার শুক্লা বিনিদ্র রজনী যাপন করছে।" তিন মাস ধরে সমস্ত নীলকর সাহেবদের দ্বারা কুক্ষিগত করা চাষের এলাকায় সংশ্লিষ্ট চাষিদের সাথে কথা বলে, নয় হাজার দরখাস্ত নিয়ে ফিরে এলেন। এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে বললেন, "স্যার, দরখাস্তগুলো পড়বেন। আমার আলাদা করে কিছু বলবার নেই।" সেই ম্যাজিস্ট্রেটের মানবতাবোধ তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। তিনি দরখাস্তগুলো দেখে, সবগুলো না পড়ে র‍্যানডাম কিছু পড়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলে দিলেন, "এখন থেকে নীল চাষ বাধ্যতামূলক নয়। যদি কাউকে জোর করে নীল চাষ করানোর চেষ্টা করা হয়, তিনি আইনের চোখে অপরাধী সাব্যস্ত হবেন। আর যারা নীল চাষে সাড়া দেবে তাদেরও লাভের এক তৃতীয়াংশ দিতে হবে। তাদের বঞ্চিত করা যাবে না।" বার্তা ছড়িয়ে গেল বিদ্যুতের মতো। জে. বি. কৃপালিনী এলেন, রাজেন্দ্র প্রসাদ এলেন, সবাই এসে গান্ধীজীকে জড়িয়ে ধরেছেন। "আপনি একটা ইতিহাস রচনা করলেন।" তিনি ফিরে এলেন ওই সাবরমতীতে। যে লোকটি অর্থ দিয়ে গেছিল, নাম বলেনি। তার নাম জানা গেল, যখন সাবরমতীতে এসে এক ভদ্রমহিলা বললেন, "আমি অনুসুয়া সারাভাই। আমি আপনার কাছে আবেদন নিয়ে এসেছি। আমেদাবাদ কটন মিলের শ্রমিকরা, বস্ত্র উৎপাদক কারখানার শ্রমিকরা, আজ আন্দোলনে নেমেছে। কারণ যে মজুরি তাদের দেওয়া হয়, তা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত এবং ৫০ শতাংশ মজুরি যদি না বাড়ানো হয়, তারা কাজ করবে না।" তখন জানলেন, অনুসুয়া যে শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যে মিল মালিকদের বিরুদ্ধে, সেই মিল মালিকদের যিনি সভাপতি, তাঁর নাম আম্বালাল সারাভাই— অনুসুয়ার দাদা এবং তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি গান্ধীকে ১৩ হাজার টাকা দিয়ে এসেছিলেন।

গান্ধী কোনও আন্দোলনে প্রথমে নামতেন না। প্রথম আবেদন, নিবেদন— বিবেকের কাছে আবেদন করে, বোঝাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু আম্বালাল— ওঁরও একটা ইগো ছিল, আত্মাভিমান ছিল, কাউকে সহজে মানতে চান না। তখন গান্ধী বললেন, "ঠিক আছে। ওরা ধর্মঘট করবে না। কাজে যোগ দেবে। কিন্তু আপনি বলুন, যে মজুরি নিয়ে আবার আলোচনায় বসবেন ওদের সাথে। আমি থাকব।" তিনমাস নিরন্তর আলোচনার পরে ৩৫ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি হল। চম্পারন, মিল ওয়ার্কার'স স্ট্রাইক। ১৯১৭-র ইতিহাস দেখল চম্পারন, ১৯১৮-তেই ইতিহাস দেখল বস্ত্র শ্রমিকের সফল ধর্মঘট। আর ১৯১৮-তে গুজরাটে, আমেদাবাদের সন্নিহিত এলাকা, খেড়া জেলাতে 'নো ট্যাক্স ক্যাম্পেইন' শুরু হ'ল। কারণ, দুর্ভিক্ষ হয়েছে। ট্যাক্স বাড়ানো বই কমানো হয়নি। চাষিরা বলল, "দেব না। দরকারে চাষ করব না। দেব না।" আবার সবরমতীর কড়া নাড়ছে লোকেরা— "আপনি আসুন"। গান্ধী গেলেন। জেলা প্রশাসনের সাথে আলোচনা করে অন্তত একটা সম্মতি আদায় করে নিলেন যে, ট্যাক্স যদি বৃদ্ধিও হয়ে থাকে, এখন দিতে হবে না। যখন ভাল ফসল হবে তখন দিতে হবে। অর্থাৎ ১৯১৬-১৭-১৮ গান্ধীর সাফল্যের ইতিহাস।

সে'সময় টিভি নেই, মোবাইল নেই, টুইটার নেই, ফেসবুক নেই, টেলিফোনও সেভাবে নেই। তাতে অন্তত আমার মনে হয়েছে, গান্ধীর শাপে বর হয়েছে। দেশে তখন রটে গিয়েছে চারিদিকে, গান্ধীবাবা যেখানে যাচ্ছেন সেখানে মন্ত্রের মতো কাজ হচ্ছে। ইতিহাস বদলে যাচ্ছে। গান্ধী জুতো, গান্ধী বিড়ি, গান্ধী সিগারেট, গান্ধী কাপড়, গান্ধী লুঙ্গি— সব গান্ধীর নামে বাজারে আসতে শুরু করল। এই পটভূমিকায়, ব্রিটিশ বুঝতে পারছে, এখন পদক্ষেপ না নিলে হয়তো বা এই নিয়ন্ত্রণ রাখা যাবে না। ১৯১৯-এ রাওলাট অ্যাক্ট আনা হ'ল। অর্থাৎ বিনা বিচারে যে কাউকে কারারুদ্ধ করে রাখা যাবে, যদি ব্রিটিশ মনে করে, তাঁর আচরণ দেশদ্রোহিতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। গান্ধী বললেন, "এটা মানা সম্ভব নয়"। কিন্তু তাঁর তো মন্ত্র 'অহিংসা'। তিনি বললেন "আমরা রাওলাট অ্যাক্ট-এর বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে ৭ই এপ্রিল হরতাল পালন করব", যা 'সত্যাগ্রহ' নামে পরিচিত। কোথাও কোথাও ছোটখাটো সংঘাত, সংঘর্ষ, পুলিশের গুলি, লাঠি চালনা— তার প্রতিবাদে ১০ই এপ্রিল (রাম নবমীর দিন) অমৃতসরে মিছিল বেরলো। নেতৃত্বে সত্যপাল এবং সইফুদ্দিন কিচলু, একজন হিন্দু, একজন মুসলমন। তাঁরা বলল "১৪৪ মানি না। আমরা ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে প্রতিবাদ সভা করে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হব।" প্রশাসন বলল, "১৪৪ ধারা জারি হয়ে গেছে। এই মিছিলই অবৈধ। সমাবেশের প্রশ্ন ওঠে না।"

আমরা জানি, ১৩ই এপ্রিলের সমাবেশ, গুলি চালনা, ৩৩৯ জন শহিদ, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ঈশাই— সকলের বুকের রক্তে বোধহয় ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রথম প্রস্তরটা প্রোথিত হ'ল। গান্ধী সে সময় ব্যস্ত ছিলেন এবং সত্যই, তখনকার দিনে সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ এসে পৌঁছবার কোনও সুযোগ ছিল না। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড তাঁর কানে যখন পৌঁছাল তখন প্রথম মহাযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে তুরস্ক হেরে গেছে ব্রিটেনের কাছে এবং তুরস্কের খলিফাকে অপসরণই শুধু করা হয়নি, তাঁর যে খলিফার সম্মান, সেটাও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। গান্ধী দেখলেন, এটাই তো সুযোগ। একদিকে জালিয়ানওয়ালাবাগ, অন্য দিকে খিলাফত— দেশ জুড়ে তিনি শুরু করলেন অসহযোগ আন্দোলন, যাকে ইংরাজিতে আমরা বলি নন-কোওপারেশন। দেশ জুড়ে শুরু করলেন যাত্রা, সঙ্গে মহম্মদ আলি আর সৌকত আলি। তুখোড় বক্তা দুজনেই। দুই ভাই। গান্ধী তো কৌপিন পরা, ছোট্ট-খাট্টো চেহারা। মহম্মদ আলি একটা সভায় বললেন, 'আমি অহিংসায় বিশ্বাস করি না, কিন্তু এই যে ছোট্ট মানুষটি বসে আছেন, আমি চাইলেই যাকে আমার জোব্বার পকেটে ভরতে পারি, তাঁকে উপেক্ষা করে আন্দোলন করার সাহস আমার নেই। তাই আমাকে বলতে হচ্ছে হিংসা নয় অহিংসাকে হাতিয়ার করে লড়তে হবে।'

যেখানেই যাচ্ছেন, গ্রামের মুখিয়ারা (প্রধানরা) ইস্তফা হাতে ধরিয়ে দিচ্ছেন। থানার ইন্সপেক্টররা পদত্যাগ করছেন। তহশিলদাররা পদত্যাগ পত্র জমা দিচ্ছেন। একটা বিদ্যুতের তরঙ্গ গোটা দেশে বয়ে যাচ্ছে। দেখলেন, এই আন্দোলন যখন ভিতটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, তখনই চৌরিচৌরায় ১৯২২-শের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি থানায় অগ্নিসংযোগ করে ১৭-জন (পুলিশ) সিপাহিকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হ'ল। গান্ধী বললেন, "দেশ এখনও তৈরি হয়নি। 'অহিংসা' এখনও তারা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করে নি। কাজেই এ আন্দোলন আমি এখানেই থামিয়ে দিতে চাই।" ইতিমধ্যে চৌরিচৌরার মতো না হলেও বহু জায়গাতে সংঘর্ষের কাহিনি উঠে আসছে, লড়াইয়ের কাহিনি উঠে আসছে। ব্রিটিশ দেখল, এখুনি যদি আমরা সঠিক পদক্ষেপ না নিই তা'হলে ভবিষ্যতে এ আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করা মুশকিল হবে। গান্ধী গ্রেফতার হলেন এবং ১৯২৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর কারাবাস শেষ হ'ল। সেপ্টেম্বরে শুনলেন, নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার-এ কোহাট বলে একটি জায়গাতে একজন হিন্দু পুরোহিত হজরত মহম্মদের সম্পার্কে কুৎসা এবং অসত্য মিশ্রিত একটি ইস্তাহার বন্টন করার ফলশ্রুতিতে দাঙ্গা হয়েছে। সেই দাঙ্গা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, গান্ধী অনশন শুরু করলেন। একুশ দিন অনশন। প্রথমদিকে ডাক্তাররা উদ্বিগ্ন হচ্ছে, লোকটার প্রেসার কমে যাচ্ছে। লোকটার ওজন কমে যাচ্ছে।

কিন্তু ছয়-সাত দিনের মাথায় দেখা গেল— ওজন বাড়ছে, প্রেসার স্বাভাবিক হচ্ছে। শুধু আছেন লেবু-জল খেয়ে। যখন শেষ পর্যন্ত কোহাট থেকে বার্তা এল, হিন্দু-মুসলমান একসাথে বলছে, আমরা শান্তিতে থাকব।

আমরা শান্তি মিছিল করছি। একুশ দিনের মাথায় তিনি অনশন প্রত্যাহার করলেন।

'২৩শের শেষে '২৪শে, জীবনে একবারই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হতে সম্মত হয়েছিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হওয়ার পরে তাঁর মনে হ'ল, দেখেছি তো অনেক জায়গা। কিন্তু যে মানুষটিকে না দেখলে ভারত দেখা হয় না, যে মানুষটিকে না দেখলে ভারত বোঝা যায় না, যে মানুষটি আমাকে প্রয়োজনে সঠিক পথ দেখাতে পারে, তাঁর সাথে একবার দেখা করা প্রয়োজন। তিনি এলেন বাংলায়, গেলেন শান্তিনিকেতনে। প্রথম রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করলেন 'গুরুদেব' বলে। আমরা বলি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী 'মহাত্মা' হয়েছিলেন চম্পারনে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্রথম 'মহাত্মা' বলে সম্বোধিত করেন। কিন্তু ইতিহাস বলে, গুজরাটের কাথিওয়ারে, যেটা তাঁর জন্মভূমি, সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসবার পরে যে সম্বর্ধনা সভা হয়, গুজরাটের লোকেরা সেখানে যে মানপত্র পেশ করেছিল তাতে তাঁকে প্রথম 'মহাত্মা' বলে সম্বোধন করা হয়েছিল।

যাই হোক, এরপর ১৯২৫-এর ৩রা জুন তিনি এলেন দার্জিলিং। শিলিগুড়ি অবধি ট্রেন আছে, তারপরে যে ট্রয় ট্রেন তাতে এতো সময় লাগে, তিনি পদব্রজে দার্জিলিং রওনা দিলেন এবং সেখানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন-এর যে বাসভবন, সেই বাসভবনে তাঁর সাথে তিন দিন অতিবাহিত করলেন। এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ইতিমধ্যে জেনে গেছেন, যে গান্ধীর গোরুর দুধ সহ্য হয় না বলে ছাগলের দুধ খান। শিলিগুড়ি থেকে পাঁচ-ছয়টি ছাগল এনে রেখেছেন যাতে গান্ধীজির কোনও অসুবিধা না হয়। '২৫শের বঙ্গ ভ্রমণের পরে খবর পেলেন ভারতের দক্ষিণে আর একটা আন্দোলন শুরু হয়েছে। সে আন্দোলন তাঁর হৃদয়ের কাছের আন্দোলন। সেখানে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে রাজার ডেইটি 'পদ্মনাভ' মন্দির। সেই পদ্মনাভ মন্দির, শুরু থেকেই যেখানে অচ্ছ্যুতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। সেখানে তারা টি. কে. মাধবনের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ শুরু করেছে। গান্ধী চলে এলেন এবং তাদের সঙ্গী হয়ে শেষ পর্যন্ত ত্রিবাঙ্কুর-এর মহারাজাকে বোঝাতে সক্ষম হলেন, যে ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণদের মতো পূজা করবে। তারা যখন পূজা করবে কেউ প্রবেশ করবে না। কিন্তু তারপর অচ্ছ্যুতদের প্রবেশাধিকার দিতে হবে। সেই প্রথম তাঁর দ্বিতীয় অ্যাজেন্ডা, 'রিমুভ্যাল অব আনটাচেবিলিটি'-র একটা সূর্যোদয় ঘটল।

১৯২৬শে তিনি বললেন, অনেক ঘুরেছি, একটা বছর একটু আশ্রমটাও দেখতে হবে। চলে এলেন সাবরমতীতে। সে বছরটা আশ্রমে আছেন। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের শূন্যতা— কারণ গান্ধীর আগে তো কেউ জাতীয় নেতা হয়নি। তিলক মহারাষ্ট্রের নেতা, লালা লাজপত রায় পাঞ্জাবের নেতা, বিপিন চন্দ্র পাল বাংলার নেতা। একমাত্র গান্ধী প্রথম জাতীয় নেতা হিসাবে উঠে এলেন আন্দোলনের ভিতর দিয়ে। এবং প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আন্দোলন সফল করতে ভলান্টারি পভার্টি বা স্বেচ্ছাদারিদ্র, সেই দারিদ্রকে গ্রহণ করে দরিদ্র মানুষের সাথে একাত্ম হলেন। সমস্ত ধর্মের গরিব মানুষকে একত্রিত করেন, যা শঙ্করাচার্য পারেন নি। যা সম্রাট অশোক ধরে রাখতে পারেন নি। সেই প্রথম এই ঐক্যের 'প্রভাত' ঘটালেন। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে দারিদ্রের দ্বারা শৃঙ্খলিত মানুষ আসমুদ্র হিমাচল গান্ধীজীর নেতৃত্বে একত্রিত হ'ল। তাঁকে ছাড়া চলবে কী করে? ইতিমধ্যে তরুণ তুর্কী নেহেরু, তরুণ তুর্কী নেতাজি তাঁরা পুরোভাগে চলে এসেছেন। তিলকের মৃত্যু হয়েছে। ১৯২৭-শে মাদ্রাজ অধিবেশনে প্রস্তাব পেশ হ'ল 'পূর্ণ স্বরাজ'। গান্ধী তা পাস হতে দিলেন না। বললেন, আর একটু সময় দিতে হবে। '১৭-তে আয়ারল্যান্ড হোমরুল পেয়েছে, আজ অস্ট্রেলিয়া ডোমেনিয়ান স্ট্যাটাস পেয়েছে, অন্তত সেটা চেয়ে দেখি। দুই বছরের ভেতরে না যদি পাই তাহলে পূর্ণ স্বরাজ-এর দাবি জানাব।

ইতিমধ্যে সর্দার প্যাটেল বরদৌলিতে ১৯২৮-এ 'নো ট্যাক্স ক্যাম্পেন' করে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। গ্রামের লোকেরা, বিশেষত কৃষক সম্প্রদায়, তাঁর নেতৃত্বে এলাকা ত্যাগ করে চলে যেতে রাজি হ'ল, তা'ও বর্দ্ধিত হারে খাজনা না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল রইল। সেখানকার বার্তা যখন এল গান্ধী রওয়ানা দিলেন প্যাটেলের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। দীর্ঘ আন্দোলনের পর সরকার নতি স্বীকার করে বর্দ্ধিত হারে কর আদায় করা শুধু নয়, সাময়িকভাবে খাজনা সংগ্রহ বন্ধ রাখতে সম্মত হ'ল।

'২৭-এর প্রস্তাবের ফলশ্রুতিতে ১৯২৯-এর লাহোর কংগ্রেসে, পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব পাশ হ'ল। কিন্তু গান্ধী তো প্রস্তাব, সম্মেলন, ইংরেজি বক্তৃতা, চোগা-চাপকান এগুলোর বাইরে ভারতটাকে গড়তে চেয়েছেন। তাই তাঁকে এমন একটা বিষয় হাতে নিতে হবে যাতে মানুষ মনে করে গান্ধী তার কথা বলছে। গান্ধী তাদের জন্য লড়ছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজত্বের শুরু থেকে— ভারতবর্ষের দরিদ্রতম মানুষ থেকে ধনী মানুষটির যা অপরিহার্য ছিল প্রতিদিন— লবণ— সেই লবণের উপর কোম্পানির একচেটিয়া আধিপত্য এবং শুল্ক। গান্ধী মনে করলেন, এর চেয়ে বড় শোষণ আর কিছু হতে পারে না। তিনি ঘোষণা করলেন— "আমরা লবণ আইনকে অমান্য করব"। গুজরাটের পশ্চিম উপকূলে লবণ এমনিই পড়ে থাকে। নোনা জল আসে, যখন নেমে যায় লবণ ফেলে যায়। গান্ধী শুরু করলেন ডান্ডি অভিমুখে যাত্রা। বয়স তখন চৌষট্টি। গান্ধী এসেছেন ভারতবর্ষে ৪৫ বছর বয়সে। ১৯৩০-এর ১২ই মার্চ থেকে হেঁটে ৬ই এপ্রিল ডান্ডিতে পৌঁছে ৭২ জন সাথীকে নিয়ে, সমুদ্র পাড় থেকে একমুঠো লবণ নিয়ে প্রতীকী আইন অমান্য করলেন। ব্রিটিশ ভাবেনি এর পরের পদক্ষেপে গুজরাটের মানুষেরা দারাসানাতে যে সরকারি লবণ প্রস্তুতকারী কারখানা আছে সেটা দখল করতে যাবে। যখন সেই প্রস্তুতি হচ্ছে, আবার গান্ধী গ্রেফতার।

১৯৩০-শে গান্ধী লবণ আইন ভাঙছেন। গান্ধীর লবণ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াতে দেশ জুড়ে এমন কী সুদূর বাংলায় সোদপুরের মতো আশ্রম থেকে সতীশ দাসগুপ্তের নেতৃত্বে লবণ আইন ভঙ্গ হচ্ছে। তখন ব্রিটিশ গান্ধীকে বলছে, লন্ডনের রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে আসুন। গান্ধী বললেন, "আমরা যাব না। অ্যাজেন্ডা ছাড়া রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স-এ যাব না। মুসলিম লিগ গেল, হিন্দু মহাসভা গেল, অন্যান্য ছোট ছোট টুকরো টুকরো পার্টি এবং মধ্যপন্থী কিছু ব্যক্তিত্ব— তেজবাহাদুর সপ্রু, এম আর জয়কর— তাঁরাও গেল।

মুসলিম লিগের পুরো নেতৃত্বটাই যখন লন্ডনের রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করছে, তখন এলাহাবাদে মুসলিম লিগের অ্যানুয়াল কনফারেন্স হচ্ছে এবং সেই অ্যানুয়াল কনফারেন্স-এ উদ্যোগতারা দেখলেন, জিন্নার মতো বক্তা নেই, লিয়াকত আলীর মতো নেতা নেই, কে সভাপতিত্ব করবে? তাই ডাকলেন ইকবালকে, আজও যার গান গাওয়া হয়, 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা, হিন্দুস্তান হামারা'। ভাবলেন খুব ভাল বক্তৃতা না করলেও শের-শায়েরি, গান করে

সম্মেলনটাকে উৎরে দেবেন।

এলাহাবাদে সম্মেলন হচ্ছে, ইকবাল বক্তৃতা করছেন। সভাপতির ভাষণে, প্রথম একটা স্বপ্ন দেখালেন মুসলমানদের। সিন্ধ, পাঞ্জাব, নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার, বালুচিস্তান— এই ক'টা রাজ্য নিয়ে আরেকটা ভারতবর্ষ হতেই পারে, সেটা সংখ্যালঘুদের ভারতবর্ষ। সেটা মুসলমানদের ভারতবর্ষ। সেই প্রথম এই ভাবনাটা ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে শুরু করল। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে জিন্না বললেন, এ সমস্ত অবাস্তব কথার কোনও অর্থ হয় না। বস্তুত, জিন্না শুরু থেকে সাম্প্রাদায়িক ছিলেন না। জিন্না কংগ্রেসে গেছেন গান্ধী আসবার আগে, জিন্না কংগ্রেসে গেছেন নেহেরু আসবার আগে, জিন্না কংগ্রেসে গেছেন সুভাষ বোস আসবার আগে। জিন্না তখনও বিশ্বাস করছেন, মর্লে-মিন্টো রিফর্মসের ফলে ১৯০৯ সালে ব্রিটিশ ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি-তে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য যে সেপারেট ইলেকটোরেট দিয়েছে— মুসলিমদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।

১৯৩০ সালে গান্ধী গ্রেফতার হলেন কেন? যে আন্দোলন নামেই আইন অমান্য, কেউ মরছেও না, কাউকে মারছেও না, অথচ ভূমিকম্পের মতো ব্রিটিশের ভিতটা নড়ে যাচ্ছে। গ্রেফতার হলেন গান্ধী। এবার তাঁকে নিয়ে যাওয়া হ'ল পুনাতে। ব্রিটিশ ১৮৫৭ সালেই বুঝেছিল, এই ভারতের হিন্দু মুসলমান একসাথে যে বিদ্রোহের নজীর স্থাপন করেছে সেটা যদি চিরতরে ব্যর্থ করা না যায়, একদিন দেশটাকে স্বাধীনতা দিয়ে যেতেই হবে। সেদিনই তারা ১৮৫৭-এর বিপ্লবকে মাথায় রেখে আজিমুল্লা, নানাসাহেব, তাতিয়া টোপী, বেগম হজরত মহল—সকলের লড়াই দেখে বুঝে গেছিলেন এই ২৫ শতাংশ মুসলমান এবং ৭৫ শতাংশ হিন্দু যদি একত্রিত হয়, শুধু রণজিৎ সিং-কে দিয়ে আর নেপালের গোর্খা দিয়ে এদেশটাকে শাসনে রাখা যাবে না।

মর্লে-মিন্টো রিফর্মস সামনে রেখে ব্রিটিশ যখন ভারতীয়দের বলল, তোমাদের শাসন ব্যবস্থায় জায়গা করে দিচ্ছি, সেদিনই সেপারেট ইলেক্টোরেট করে মুসলমানদের বার্তা দিল, হিন্দুরা তোমাদের নাও নিতে পারে, তাই তোমাদের একটা রক্ষাকবচ দিলাম।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হল ১৯৩১-এ। এবার কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিল, এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করবে। যদিও অনেকে বলেছিলেন, নেহেরু, মদনমোহন মালব্য ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে নিয়ে যেতে, কিন্তু শেষ অবধি ঠিক হল গান্ধী একাই যাবেন। এবং ১১ই সেপ্টেম্বর তিনি পৌঁছে গেলেন ব্রিটেনে। এবার কেন গেলেন? কারণ ইতিমধ্যে গান্ধী আরউইন বৈঠক হয়ে গেছে (৫ই মার্চ ১৯৩১) এবং ফলশ্রুতিতে সমস্ত জেলবন্দি সত্যাগ্রহীদের নিঃশর্ত মুক্তিদান করা হয়েছে, সব মামলা প্রত্যাহিত হয়েছে আর সাধারণ মানুষ তাদের প্রয়োজনে সরাসরি প্রাকৃতিক লবণ সংগ্রহ করতে পারবে— এ অনুমতি পাওয়া গেছে। গিয়েছিলেন ৫ই সেপ্টেম্বর, আর ফিরলেন ৫ই ডিসেম্বর। জাহাজে বসেই জানতে পারলেন, উত্তরপ্রদেশে কর আদায়কে কেন্দ্র করে চাষিদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু হয়েছে এবং তার প্রতিবাদে নেহেরু তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। গান্ধী ফিরেই নেহেরুর আন্দোলনের পাশে দাঁড়ালেন, আর ব্রিটিশও অপেক্ষা করল না। আবার জেল। সেই পুনায় ইরাভেরা জেলে আবার তাঁকে বন্দি করে রাখা হ'ল।

গান্ধী জেলে, পুনাতে। ম্যাকডোনাল্ড-এর কনজারভেটিভ সরকার ইংল্যান্ডে। যেখানে মুসলমানের সেপারেট ইলেক্টোরেট-ই কংগ্রেস দিতে রাজি নয়, সব সময়ে বলেছে যে, আমরা জয়েন্ট ইলেক্টোরেট-এ লড়তে চাই, সেখানে, সিঙ্গল ম্যান আর্মি, বি আর আম্বেদকর-এর দাবি মেনে ম্যাকডোনাল্ড বললেন, "না। ডিপ্রেসড ক্লাস-কেও সেপারেট ইলেক্টোরেট দেওয়া হবে।" গান্ধী বললেন, আমার মৃতদেহের উপর দিয়েই এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ১৯০৯ সালে হিন্দু মুসলমানকে যখন তোমরা ভাগ করে দিয়েছ, তখন আমি ভারতে আসিনি। আজ আমি এখানে এসেছি। আবার হিন্দুদের মধ্যে বিভাজনের রেখা টানবে, আমি গান্ধী, বেঁচে থাকতে হ'তে দেব না। পুনায় বললেন, আমৃত্যু অনশন করব। শুরু করলেন আমগাছ তলায়। এবং গান্ধীকে খুব কম দেখা গেছে, যেখানে যখন থেকেছেন, ঘরের ভিতরে শুয়েছেন, গান্ধী বরাবর বারান্দায় শুতেন। অনশন করছেন জেলখানার চত্বরে, আমগাছের তলায়। একটা খাটিয়া পেতে শুয়ে আছেন। খবর পেয়ে কস্তুরবা চলে এসেছেন, মহাদেব দেশাই চলে এসেছেন। আর তেজবাহাদুর সপ্রু, জয়কররা আম্বেদকরকে বলছেন, 'তোমার সেপারেট ইলেক্টোরেট কি গান্ধীর চেয়েও বেশি জরুরি?' গান্ধী বলেছে, "হয় আমার মৃত্যু, অথবা আম্বেদকরের দাবি মেনে নেওয়া হবে।" তুমি জান না কী আগুন নিয়ে খেল'ছ।'

গান্ধী অনশনরত। ২৪শে সেপ্টেম্বর, আম্বেদকর রিল্যাকটেন্টলি বলল, আমি বসব আলোচনায়। জয়কর, সপ্রু, তাঁদের মধ্যস্থতায় নেহেরু, প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং অন্যদিকে আম্বেদকর ও তাঁর সাথীরা, —আলোচনা শুরু হ'ল।

শান্তিনিকেতনে তখন গুরুদেব খবর পেয়েছেন, এবার গান্ধীর বোধহয় নশ্বর দেহটা আর থাকবে না। কবির তখন ৭৪ বছর বয়স। সে সময়ে ৭৪-এ মানুষ ন্যুব্জ হয়ে যেত। প্রবল গ্রীষ্ম, সেই সময়ে আড়াই দিন ট্রেন যাত্রা করে পুনায় এলেন। রবীন্দ্রনাথ আসছেন। গান্ধী খবর পেয়েছেন। আম্বেদকর ইতিমধ্যে মেনে নিয়েছেন, ঠিক আছে, আমাকে যদি ৭১-এর বদলে ১৪৮টা আসন দেওয়া হয়, আমি জয়েন্ট ইলেক্টোরেট-এ থাকব।

গান্ধী বললেন, এই সুযোগ তো ছাড়া যাবে না, গুরুদেব আসছেন। আমি অনশন তখনই ভাঙব যখন গুরুদেব আসবেন। রামচন্দ্র গুহ তাঁর বইতে বলেছেন, পুনার জেল গেট দিয়ে ন্যুব্জ রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে, থপ থপ করে গান্ধীর খাটিয়ার কাছে এসেছেন। ঘুমিয়ে ছিলেন, মহাদেব দেশাই বলছেন, গুরুদেব এসেছেন, তিনি জেগেছেন। মুখে স্মিত হাসি, তাকিয়েছেন। গান্ধী গুরুদেবের দাড়িতে চিরুনি চালানোর মতো আঙুলগুলো চালিয়ে দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। তারপরে যখন জেগেছেন, কস্তুরবার তত্ত্বাবধানে একজন হরিজন-এর হাতে কমলার রস পান করে অনশন ভাঙলেন। এবং খবর এল ম্যাকডোনাল্ড সেপারেট ইলেক্টোরেট-এর বিল প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

জিন্না তখন হতাশ এবং বরাবরই একা। জিন্না একা থাকা সত্ত্বেও মুসলিম লিগের মঞ্চে অপরিহার্য ছিলেন। কারণ ওরকম একজন বক্তা, মুসলমান সমাজ কেন, সারা ভারতবর্ষে তখন ছিল না। কিন্তু দেখছেন, মুসলিম লিগের কোনও ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। উনি মনস্থির করে '৩৩শে চলে গেলেন ইংল্যান্ড এবং জিন্না অ্যাজ ব্যারিস্টার সাকসিডেড মাচ ইন ইংল্যান্ড দ্যান ইন বম্বে। শুধু যদি প্রফেশন-এ থাকতেন, তাহলেই ইতিহাসে একটা জায়গা হয়ে যেত। তিনি চলে গেলেন ইংল্যান্ড-এ।

গান্ধী সেদিনই বুঝতে পেরেছিলেন, বাধা শুধু জিন্না নয়, আর একটি বাধা আমার সামনে। গান্ধীর চেয়ে ২৭ বছরের ছোট আম্বেদকার। জেল থেকে মুক্তির পর আর গেলেন না কংগ্রেসের অধিবেশনে, গেলেন সাবরমতী আশ্রমে। বেরিয়ে পড়লেন 'ভারত যাত্রায়', যাকে 'হরিজন যাত্রা' বলা হয়েছে। সর্বত্র প্রান্তে প্রান্তে গিয়ে অচ্ছুতদের 'হরিজন' নামে সম্বোধন করে লাগাতার তিন তিনটি বছর শুধুমাত্র আম্বেদকারের দেওয়া একটা যন্ত্রণাকে হাতিয়ার করে, দেশের মধ্যে বিভাজনের যে প্রচেষ্টা এবং ব্রিটিশের যে আসকারা বা প্রশ্রয়, তাকে নেগেট করা— গান্ধীর অনেক বেশি প্রয়োজন বলে মনে হ'ল। ৩৪শে গান্ধী বললেন, "এখন তো সুভাষ আছে, এখন তো নেহেরু আছে। এখন আমাকে একটু অন্য কাজ করতে দাও।" সবাই বলছে, "তা বললে হয়? আপনি মূল কাণ্ডারি, আপনি সরে গেলে নৌকাটা পথ হারিয়ে ফেলবে। হবে না।" "আমি জহরকে আর সুভাষকে চিনি। ওরা ঠিক নিয়ে যাবে।"

তিনি চারটি অ্যাজেন্ডা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন। '৩৪ থেকে তিনি স্বরাজের কাজটা নেহেরু, প্যাটেল, সুভাষদের হাতে ন্যস্ত করে বাকি তিনটি দায়বদ্ধতা পালনে মনোনিবেশ করলেন। এক সময়ে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াবার সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছিলেন।

ইতিমধ্যে তাঁর কর্মস্থল, সাবরমতী থেকে ওয়ার্ধায় স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। জায়গাটি দেশের প্রায় কেন্দ্রস্থলে। আর ওয়ার্ধা থেকে আরও খানিকটা প্রত্যন্ত এলাকা— সেওগাঁতে তাঁর পালিতা কন্যা মীরাবেন নিজে একটি আশ্রম করে থাকতে শুরু করেছে। পরবর্তীতে এই সেওগাঁই সেবাগ্রাম হয়ে গান্ধীর প্রধান কর্মস্থল হয়ে ওঠে। '৩৮শে তিনি কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিলেন ও মূলত হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, খাদি ও গ্রামীণ শিল্পের প্রৎসাহন তখন তাঁর মূল অ্যাজেন্ডা।

ব্রিটিশ বুঝতে পারছে, শোষণের দিন শেষ হয়ে আসছে। গভর্মেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অব ১৯৩৫ তৈরি হ'ল। ১১টি রাজ্যে '৩৬শে নির্বাচন হ'ল। ৮টি রাজ্যে কংগ্রেসের সরকার, তিনটি রাজ্যে— অবিভক্ত বাংলায়— ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি, সিন্ধ-এ সেকেন্দর হায়াত খান এবং স্যার ছোটুরামের ইউনিয়নিস্ট পার্টি আর পাঞ্জাবে একটা কোয়ালিশন সরকার। ইতিমধ্যে সরকারের এক বছর, সোয়া এক বছর পার হতে হতে হিটলার ফ্রান্স আক্রমণ করে দিয়েছে। হিটলারের সাথে স্তালিনের গোপনে 'অনাক্রমণ চুক্তি' শুধু হয়নি, ঠিক হয়েছে, দু'জনে মিলে ইউরোপটাকে ভাগ করে নেবে। কিন্তু ফ্রান্স যখন আক্রান্ত হয়েছে, ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং ভাইসরয় একতরফা বলে দিয়েছে, এই মুহূর্তে ভারত মিত্রশক্তির সাথে আছে। কংগ্রেস বলল, "তুমি কে? ভারতের হয়ে, ভারত আছে বলার, তুমি কে? ভারত বলবে। আমরা তো ফ্যাসিজম-কে, নাজিইজিম-কে পরাস্ত করতে চাই। আমরা মিত্রশক্তির সাথে যেতে আগ্রহী। কিন্তু তোমার তাঁবেদার হিসাবে নয়, একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে।" গান্ধী বললেন, "তুমি

যুদ্ধে বিব্রত, কিন্তু আমি তো আমার দাবি ছেড়ে আসতে পারছি না। তাই আজ দেশ জুড়ে আন্দোলন নয়। আজ ইন্ডিভিজুয়্যাল সত্যাগ্রহ শুরু হবে।' '৪০ সালে শুরু হ'ল। প্রথম সত্যাগ্রহী বিনোবা ভাবে, দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী পণ্ডিত নেহেরু এবং তারপরে রাজ্যে রাজ্যে হাজারে হাজারে সত্যাগ্রহী এগিয়ে আসছে। পুলিশ মাথায় লাঠি মারছে। সামনের লোকটি পরে যাচ্ছে, পেছনের লোকটি এগিয়ে আসছে। '৪১ আসতে আসতে ২৫ হাজার লোক কারারুদ্ধ হয়েছে। অহিংস, নিরস্ত্র— একটাই শক্তি, একটাই স্লোগান— "গান্ধী বাবা কি জয়"। এবং ব্রিটিশ দেখল আর দেরী করা যাবে না। আলোচন শুরু করো। '৪২-এ তাই স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস-এর মিশন এল, কংগ্রেসের সাথে আলোচনা করার জন্য, আর কংগ্রেস ইতিমধ্যে প্রতিবাদ করে আটটি রাজ্যে সরকার থেকে পদত্যাগ করাতে, মুসলিম লিগ— যার কোথাও সরকার ছিল না, কিন্তু 'আয়ারাম-গয়ারাম'-রা ছিল— তাদের নিয়ে ছয়টি রাজ্যে সরকার বানিয়ে নিল। যে মুসলিম লিগ কোনও প্রকার প্রভাব ফেলতে পারেনি সম্মেলন করে, যে মুসলিম লিগের সম্মেলনে ১২০ থেকে ১২৫ জন মানুষ হত, সেই মুসলিম লিগ যখন ১৯৪০-শে লাহোর অধিবেশন করছে, 'পাকিস্তান' প্রস্তাব পাস হচ্ছে তখন সেখানে উপস্থিতির সংখ্যা দশ লক্ষ এবং প্রস্তাবক কে? ফজলুল হক। '৪০ সালে ফজলুল হক প্রস্তাব দিলেন, এবার আমরা আলাদা রাষ্ট্র চাই। এবং জিন্না বললেন, "এটাই তো ভুল। কে সংখ্যাগুরু কে সংখ্যালঘু? আমরা তো দুটো জাতিস্বত্বা। টু সেপারেট নেশানস। উই নিড টু হ্যাভ টু সেপারেট কান্ট্রিস।" কংগ্রেস স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস-কে বলছে, "হয় পরিষ্কার বলো যুদ্ধের পরে স্বাধীনতা দেবে" অথবা গান্ধীর ভাষায় বলছে "ফিরতি বিমানে ফিরে যাও, সময় নষ্ট কোরো না।" ব্রিটিশ দেখছে, একদিকে কংগ্রেসের অসহযোগিতা, যুদ্ধের সময় দেশের ভিতরে আন্দোলন, আরেক দিকে মুসলিম লিগ সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, কাজেই ভাষা বদলাতে শুরু হ'ল। '৪২শের আন্দোলন, সবাই জানেন, ৮ই আগস্ট শেষ রাতে সবাই গ্রেফতার হয়ে গেল। একেক জনকে এক এক জায়গায়। গান্ধীকে নিয়ে যাওয়া হ'ল পুনায় 'আগাখান প্যালেস'-এ। এবার মহাদেব দেশাই, কস্তুরবা বলল, —আমরাও যাব। ব্রিটিশ বলল 'ঠিক আছে যাও'।

নেতৃত্ব জেলে, আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। মুসলিম লিগ বলছে, "আমরা তো আছি"। ব্রিটিশের ভাষা বদলাচ্ছে, স্ট্যাফোর্ডক্রিপস-ও জেনে গেছে, ইংল্যান্ড দাবি মানে নি। গান্ধী বললেন, "এটাই শেষ লড়াই"। গোটা দেশ লড়ছে। আমরা কোথাও কোথাও হয়ত কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে সম্পূর্ণ ইতিহাসটা সামনে আনি না। জানি না কেন! এই যে বলা হয় সমস্ত নেতৃত্ব গ্রেফতারের পরে, সাড়া দেশে আন্দোলন হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত। স্বতঃস্ফূর্ত নয়।

'ক্যুইট ইন্ডিয়া রেভ্যুলিউশন— দ্য ইথস অব ইটস সেন্ট্রাল ডাইরক্টোরেট' (কে. কে. চৌধুরী, পপুলার প্রকাশন) জানাচ্ছে, "যদিও নেহেরু বলছিলেন, বরঞ্চ এখন আমরা অ্যাক্সিস ফোর্স-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হই। আজাদ বলছিলেন, 'একটু ভাবি না।'। গান্ধী বললেন, 'না, প্রথম মহাযুদ্ধে আমরাই ভুল করেছিলাম, এবার আর নয়। তোমরা লড় না লড়, আমি জানি মানুষ লড়বে।' কারণ গান্ধীকে ইতিমধ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুত পটবর্ধন, রামমোহন লোহিয়া, অরুণা আসফ আলি বলে দিয়েছেন, "আমরা সিএসপি প্রত্যাহার করে নিয়ে কংগ্রেসের আন্দোলনকে সামনে নিয়ে যাব।"

আমি গান্ধী গবেষক নই, তবে গান্ধীজিকে পড়ে আমার মনে হয়েছে, ওনার সবচেয়ে বড় সাফল্য, উনি ভারতবর্ষের দু'টি মৌলিক দুর্বলতাকে দু'টি শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন। ভারত নিরন্ন— তাই 'অনশন', লড়াইয়ের হাতিয়ার। ভারত দরিদ্র— তাই 'অহিংসা' লড়াইয়ের প্রধান অস্ত্র। 'ট্রুথ' ছিল গান্ধীজির কাছে ম্যাটর অব ফেইথ আর অহিংসা ছিল ম্যাটার অব স্ট্র্যাটেজি। তাই তিনি যখন বলেন, 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'— এই কথার ভেতর গণহত্যার বার্তা না থাকলেও সহিংস প্রতিরোধের বার্তা অবশ্যই ছিল। তিনি জানতেন, একটা সময় এসেছে, যখন মানুষ 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' ভেবে বলিদানের ইতিহাস লিখবে, কিন্তু আর গোলামির 'তকমা' দেশের গায়ে লেগে থাকতে দেবে না। এই প্রস্তুতির পাশাপাশি, দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ সেই পরিস্থিতি তৈরি করেছিল যে, ব্রিটিশ রেভ্যুলিউশনারি মুভমেন্ট অর্ডিন্যান্স তৈরি করেও লাগু করতে সাহস পাচ্ছিল না। কারণ, আর নতুন করে, জাপানের পাশাপাশি আর একটি শক্তিকে রণাঙ্গনে আহ্বান জানাবার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ছিল। কংগ্রেসের কাছে লড়াই ছিল ঘরে ও বাইরে। দেশের ভেতর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, দেশের বাইরে সম্ভাব্য জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশকে সচেতন করে রাখার লড়াই। '৪২' তাই শোষকের দুর্বলতম মুহূর্ত আর শোষিত গর্জে ওঠার শক্তিতে বিস্ময়করভাবে বলিয়ান। তাই গান্ধীজি স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে প্রথম সাক্ষাৎকারেই বলতে পেরেছিলেন, "আপনি বরং ফিরতি প্লেনে দেশে ফিরে যান।"

ক্রিপস মিশনের অসারতা অনুধাবন করে এবারের ('৪২) লড়াইয়ের প্রাক্কালে গান্ধীজির মানসিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যিনি সবচেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল ছিলেন, সেই মীরাবেন 'সেভেন ডেজ উইথ গান্ধী'-র রচয়িতা, ঘনিষ্ঠ সাংবাদিক বন্ধু, লুই ফিশারকে বলেছেন, "এবার হয় ব্রিটিশ যাবে, না হ'লে বাপু ইহলোক ছেড়ে যাবে। আর দ্বিতীয়টা যদি ঘটে, ব্রিটিশ কল্পনাও করতে পারবে না, তার পরিণতি কী ভয়ংকর হতে পারে।"

গান্ধীজিও লুই ফিসারকে বলেছিলেন, "এবার আমি আগের মতো করে সংগ্রামকে দেখছি না, (বোধহয় চৌরিচৌরাকে ইঙ্গিত করে) আমি জানি, এবার লড়াই পরিণতিতে না আসা পর্যন্ত থামবে না। কারণ, দেশের মানুষ আজ যে কোনও মূল্যে স্বাধীনতা চাইছে। কিন্তু সবাই এই অন্তিম লড়াইয়ের সঙ্গে থাকে নি। যদিও কোটি কোটি অর্ধনগ্ন, অনাহার ক্লিষ্ট মানুষ থেকেছে ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা নিয়ে। আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি হয়ে গেল বোম্বাই। এআইসিসি রেডিও শুরু হ'ল। প্রতিদিন জায়গা বদলাচ্ছে। কারণ যেদিন যেখান থেকে ব্রডকাস্ট হচ্ছে আন্দোলনের সাফল্য প্রচার করে, পুলিশ পৌঁছে যাচ্ছে। আবার রেডিও স্টেশন অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে। '৪২শের আন্দোলনের সাফল্যের এটাই মূল শক্তি, প্রাণ শক্তি। যার ফলশ্রুতিতে সাতারায় বিপ্লবী সরকার, বালিয়ায় বিপ্লবী সরকার এবং তাম্রলিপ্ত সরকার বাংলার তমলুকে।

গান্ধী ছাড়া পেলেন '৪৪ সালে। ইতিমধ্যে আগাখান প্যালেসে মাত্র ৫০ বছর বয়সে মহাদেব দেশাই মারা গেছেন। মারা গেছেন কস্তুরবা। এই একটা সময়, যখন দেখা গেল, গান্ধী শিশুর মতো কাঁদছেন। তাদের দু'জনকে ওই আগাখান প্যালেসের প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হ'ল। দুজন মানুষ গান্ধীর ইতিহাস লিখেছে, প্রথম পর্যায়ে— মহাদেব দেশাই, পরে প্যারেলাল। দুজনেই ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। কিছু বেশ সুন্দর সুন্দর কৌতূহলদ্দীপক তথ্য আছে তাঁদের লেখায়। এক জায়গায় মহাদেব দেশাই বলছেন, গান্ধী ভীষণ নিয়মানুবর্তিতা মানতেন। সকালে যখন পদব্রজে যাবেন, তখনই যাবেন। যখন প্রার্থনা করবেন, তখনই করবেন। সময়ের কোনও হেরফের নেই। কিন্তু গান্ধী তো তখন মহামানব। পদব্রজে যাচ্ছেন, লোক পেছন পেছন যাচ্ছে। 'একটু কথা ছিল।' দাঁড়াতে পারে না। 'হু, হাঁ'। মহাদেব দেশাই লিখছে, দেখা গেল, একটা লোক পাঁচ মিনিটের বেশি দাঁড়ালে ১৫-২০ গজ পিছনে যে লোকটা হাঁটছে, নোংরা জামাকাপড় পরা। ও' এসে দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আর প্রথম লোকটা পাঁচ মিনিটের জায়গায় সাড়ে পাঁচ মিনিট দাঁড়াচ্ছে না, পালিয়ে যাচ্ছে। মহাদেব দেশাই-কে জিজ্ঞাসা করেছে এক বিদেশি সাংবাদিক, "কী ব্যাপার বলুন তো, লোকগুলো পালায় কেন?" দেশাই বললেন, "ওই লোকটার গায়ে এতো দুর্গন্ধ যে, তাদের আর হাফ মিনিটও সহ্য করা সম্ভব হ'ত না, পালিয়ে যেত।" সেই সাংবাদিক বলছে, "গান্ধী কী করে সহ্য করছে?" "সেই জন্যই তো গান্ধী। সেজন্যই উনি গান্ধী, তুমি, তুমি আর আমি মহাদেব দেশাই।"

'৪৪শে গান্ধী মুক্তি পেলেন দু'জনের মৃত্যুর পরে। আবার '৪৫শে বাংলায় এসে, এবার উঠলেন সোদপুরে। সোদপুরে উঠলেন বাংলাকে কত গভীরে দেখা যায়, চেষ্টা করলেন। এবং যারা বলে, গান্ধীকে বাংলায় সেই আসনটা কখনও আমরা দিইনি, যেটা অন্যপ্রান্তে দিয়েছে, কারণ— সুভাষ। তাঁর প্রতি যে গান্ধীর অবিচার, বাংলা কখনও গান্ধীকে সেখান থেকে মার্জনা করতে পারেনি। ৫৬৬ দিন ছিলেন এই বাংলায় সব মিলিয়ে। একদিনের জন্যও কোথাও কেউ কালো পতাকা দেখায়নি। বরং মাউন্টব্যাটেনের কথায় বলছি, সর্বাধিক সাফল্য গান্ধী বাংলাতেই দেখিয়েছেন।

গান্ধী '৪২শে কেন এত অটুট? তিনটি কারণ, একটা হচ্ছে গান্ধীর তখন চুয়াত্ত র। তখন চুয়াত্তর বলতে একটা বেশ বয়েস। গান্ধী ভাবছেন, "না। এদেশটাকে কি স্বাধীন দেখে যেতে পারব না? এই যজ্ঞ কি মাঝপথেই নিভে যাবে? আমার জীবন যায় যাক, তবু আমি জয় দেখতে চাই।" তাই এবার আর হিংসা-অহিংসা বললেন না। বললেন, "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে", "ডু অর ডাই"। স্লোগান দিলেন, "ক্যুইট ইন্ডিয়া, ব্রিটিশ ভারত ছাড়ো।" 'ক্যুইট ইন্ডিয়া' স্লোগানটা গান্ধী নিজে উদ্ভাবন করেননি। 'ক্যুইট ইন্ডিয়া' স্লোগানটা উদ্ভাবন করেছিলেন তদানীন্তন বম্বের মেয়র ইউসুফ মেহের আলি, আরেকজন সিএসপি লিডার (কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি-র লিডার) গান্ধীর এত পছন্দ হয়েছিল যে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন।

আজকেও বহু মানুষ মনে করে, গান্ধী চাইলে ভগত সিং-এর ফাঁসি রদ করতে পারতেন। গান্ধী চাইলে সুভাষ আবার কংগ্রেসের নেতৃত্বে আর একবার আসতে পারতেন। গান্ধী বলতেন একটা কথা, "সত্যের জন্য সব কিছুকে ছাড়া যায়, কিন্তু কোনও কিছুর জন্যই সত্যকে ছাড়া যায় না"। সুভাষ এবং নেহেরু আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশি ছিলেন। কমলা নেহেরু যখন সুইজারল্যান্ড যাচ্ছেন যক্ষা আক্রান্ত

হয়ে, সঙ্গী কে? সুভাষ। নেহেরু জেলে, সুভাষ তাঁর স্ত্রীকে পৌঁছে দিয়ে আসছে। সেই সুভাষ বোধহয় আত্মাভিমানী বাঙালি বলে, গান্ধীকে সেই জায়গায় নিতে পারেননি, যেটা নেহেরু পেরেছিলেন। তিনি জানতেন যে যাই বলুক, ভারতটাকে এই লোকটা যেভাবে চিনেছে, আমি চিনি না। এখানেই সুভাষের একটা, ইংরাজিতে যাকে বলা হয়— 'ইগো', আত্মাভিমান যা নেহেরুর সাথে তাঁকে গান্ধীর প্রশ্নে একাত্ম হতে সাহায্য করেনি।

১৯৪২শে যখন গান্ধী ভাবছেন আমাকে দেখেই যেতে হবে স্বাধীনতা, তখন তাঁর ইনটিউশন বলছে— বার্মা জাপানের দখলে চলে গেছে। আন্দামান-নিকোবর দখল হয়ে গেছে। ব্রিটেন হারবেই। এটাই উপযুক্ত সময়, দেশ যখন সবচেয়ে শক্তিমান, শত্রু তখন সবচেয়ে দুর্বল। দিস ইজ দ্য রাইটেস্ট আওর টু স্ট্রাইক। এখন আর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস-কে সময় দেওয়া যাবে না। আর গান্ধী নিজে বলেননি, গান্ধীকে নিয়ে যারা গভীরে গেছেন তারা বলেন, সুভাষকে স্নেহ থেকে তো তিনি বঞ্চিত করেননি। পথ মেলেনি। হৃদয় মিলেছিল। তাই সুভাষ মনিপুর প্রান্তে এসে রেডিও-তে বলছেন, "বাপু, তুমি জাতির পিতা। আশীর্বাদ করো। আমি যেন এই লড়াইয়ে সফল হই।" জবাবে গান্ধী বলছেন, আমার একটা ছেলে, আমার থেকে আলাদা হয়ে গেল।

ভগত সিং-এর ১৯৩১শে ফাঁসি হয়েছে। গান্ধী লর্ড আরউইনকে বারবার বলছেন, "আমি বলি না সেন্টেন্স কমিউট করো। আমি বলি না, শাস্তি লঘু করো। দয়া করে অপেক্ষা করো। তোমাদের উপরেও তো কেউ আছে। অপেক্ষা করো।" ২৪শে মার্চ ফাঁসি হবে। গান্ধী যাচ্ছেন ৩১শে মার্চের করাচি সম্মেলনে যোগ দিতে। নেমেছেন জলন্ধরে। সেখান থেকে বাই রোড যাবেন করাচি। কিছু পাঞ্জাবী যুবক কালো গোলাপ দিয়ে তাঁকে রিসিভ করছে। তখন জানলেন, এখানে একদিন আগেই, গান্ধী যখন ট্রেনে, ভগত সিং-এর ফাঁসি হয়ে গেছে। গান্ধী ভেবেছিলেন, আমি বিশ্বাস করি বা না করি, দেশ মনে করছে আমি সুভাষকে সেই সাহায্য করিনি, যে সাহায্য জহর পেয়েছে। সে আশীর্বাদ করিনি, যা জহর পেয়েছে। তাই তিনি ভেবে নিলেন, সুভাষ ঢুকবে আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে, দেশটাকে উত্তাল করে দেবো 'ক্যুইট ইন্ডিয়া' আন্দোলন দিয়ে। সুভাষের আগমন আর দেশের আন্দোলন ব্রিটিশকে ভারত ছাড়া করবে। প্রচলিত ইতিহাস হয়তো অন্য কথা লিখেছে, গান্ধী-সুভাষকে বুঝতে এটাই যথেষ্ট।

গান্ধী যুগটাকে সত্যের আলোকে লেখা হোক। আজকের প্রজন্ম বুঝবে— কী মিথ্যাচার হচ্ছে, একটা ইতিহাসকে বদলে দেওয়ার জন্য! কী মিথ্যাচার হচ্ছে একটা দেশের একটা গৌরবময় ইতিহাসকে কলঙ্কিত করার জন্য!

'৪৬শের ১৬ই আগস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে মুসলিম লিগের। ১২ই আগস্ট ইন্টেরিম গভর্নমেন্ট-এর প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু। জিন্না যখন ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে ঘোষণা করছে তখন ফজলুল হকও নেই। বাংলায় '৪৬শে মুসলিম লিগের সরকার জিতেছে। আর সুরাবরদি তখন সে সময়কার প্রধানমন্ত্রী। একদিনে ছয় হাজার মানুষের নিধন কলকাতায়। ইতিহাস বলে, পুরোভাগে ছিল আরএসএস। দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে। তারপর আর সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রিত করতে পারেনি। গান্ধী সে সময়টাতে দিল্লিতে। ইতিমধ্যে খবর গেছে, কলকাতার রিট্যালিয়েশন-এ নোয়াখালিতে সাঙ্ঘাতিক দাঙ্গা হয়েছে। বাংলার গভর্নরকে বললেন, "আমি নোয়াখালি যাব।"

"এখুনি যাবেন না। আমি বলব আপনাকে।"

"ঠিক আছে। আপনি যখন বলবেন তখনই আমি যাব। কিন্তু আমি যাব" এবং গেলেন। ৬ই নভেম্বর নোয়াখালি পৌঁছালেন। একদিকে ভস্মীভূত বাড়ি, সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত হিন্দু, আর অন্যদিকে হুঙ্কার, কখনও আগুনের লেলিহান শিখা। সঙ্গে মৃদুলা সারাভাই, সঙ্গে প্যারেলাল, সঙ্গে সুশীল নায়ার, সঙ্গে স্টেনোগ্রাফার পরশুরামণ, সঙ্গে নির্মল বোস আর একজন ছিলেন তিনি বিবি আমতাস সালাম (পাঞ্জাবের গান্ধীবাদি)। এঁরা গান্ধীর সাথে এসেছেন। ঘুরছেন গ্রামে গ্রামে। ক'দিন পরে গান্ধী বললেন, এভাবে ঘুরে লাভ নেই। আমরা এক একটা গ্রাম নিয়ে বসে যাই। গান্ধী চারমাস থেকে, পরিত্যক্ত বাড়িগুলোতে হিন্দুদের ফিরিয়ে এনে, মুসলমানদের কাছ থেকে কথা আদায় করলেন "এর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না"। যখন ফিরছেন, গান্ধী ছিলেন শ্রীরামপুরে। বিবি আমাতাস সালাম ভাটিয়ালপুরে। ওখানে গিয়ে দেখছেন, আমতাস সালাম আমৃত্যু অনশন করছেন। কী ব্যাপার? ওখানকার হিন্দু মন্দির থেকে তিনটি তরোয়াল চুরি হয়ে গেছে। বিবি আমতাস সালাম বলেছেন, যতদিন তরোয়াল ফেরত না আসে, আমি অনশন ভাঙবো না। দুটি তরোয়াল ফেরত এল, একটি এল না, কারণ সেটি কাসেম নামে একটি যুবক নিয়ে পালিয়ে গেছে, তাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। গান্ধী বললেন, তবুও তো তুমি একটা ইতিহাস লিখলে। তুমি অনশন প্রত্যাহার করো। গান্ধী তাকে লেবুর রস খাইয়ে অনশন ভাঙালেন।

গান্ধী তখন '৪৭শে কখনও বিহার, কখনও কাশ্মীর ঘুরে বেড়াচ্ছেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন বললেন, "বাপু, আপনি একবার আসুন। বোধহয় শেষ সময়টা এসে গেছে।" গান্ধী এলেন, ভাইসরয়ের প্রাসাদে গেলেন। মাউন্টব্যাটেন বললেন, "নেহেরু, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সবাই পার্টিশন মেনে নিয়েছে, প্রস্তাবও পাশ করেছে। শুধু আপনার সম্মতি হলে আমরা এগোই। সেদিন ছিল ওনার মৌনব্রত। একটা কাগজে লিখলেন, 'আই অ্যাম ওবসারভিং সাইলেন্স টুডে, পারহ্যাপস ইট স্যুটস ইউ'। আবার বাংলায় ফিরে গেলেন।

নোয়াখালি ফিরে যাবেন বলে, ৯ই আগস্ট এলেন কলকাতায়। তিনদিন পর তিনি উঠলেন হায়দারী মঞ্জিল-এ। ১২ই আগস্ট থেকে তিনি সেখানে। ১৫ই আগস্ট দেশ স্বাধীন হ'ল। সাময়িক আনন্দ উচ্ছ্বাস কলকাতায় যেন অতীতের সব কালো দিনগুলিকে ভুলিয়ে ছিল। গান্ধাজি আশ্বস্ত হলেন। ঠিক করলেন, ২রা সেপ্টেম্বর আবার নোয়াখালি যাবেন, কারণ ওখান থেকে নতুন করে দাঙ্গার খবর আসছে। কিন্তু ৩১শে আগস্ট আবার নতুন করে কলকাতা অশান্ত হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে তাঁর কাছে এসে থাকতে শুরু করেছেন সুরাবরদি। আবার আমৃত্যু অনশন ঘোষণা এবং ১লা সেপ্টেম্বর থেকে তার প্রয়োগ। ৩ তারিখে কয়েকশো হিন্দু এবং মুসলমান দুর্বৃত্ত সব হাতিয়ার নিয়ে এসে জমা দিল। 'বাপু, আমরা কথা দিচ্ছি আর দাঙ্গা বাধাবো না'। ৪ তারিখে অনশন ভাঙলেন এবং ত্রিশ হাজার হিন্দু-মুসলমানকে নিয়ে পিস মার্চ হ'ল বেলেঘাটা দিয়ে, সামনে গান্ধী। এই হ'ল গান্ধী। গান্ধীকে মোদির ভারত দেখতে হয়নি। কিন্তু আজ গান্ধীকে অপহরণ

WEL COME
HOTEL YUBRAJ
&
RESTAURANT MONARCH

CHARU ARCADE | B. S. ROAD | COOCHBEHAR

CONTACT NO.
+91 9735526252, (03582) 227885

Email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubrajcoochbehar.com

করার চেষ্টা চলছে যাকে ইংরাজিতে বলা হয়— অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন।

আমি গিয়েছিলাম ১৯৮২ সালে রাশিয়াতে। একটা স্কুলে গিয়েছি। একটা কিশোরী দোভাষীর মাধ্যমে জিগ্যেস করছে, ভারতবর্ষে বুদ্ধিস্ট কত? আমি বললাম, ০.৬ শতাংশ, মেয়েটি রাশিয়ান-এ উত্তর দিল। দোভাষী বলল, মেয়েটি বলছে, "ইউ আর লায়িং"। বিশ্বাস করে না মানুষ। সেদিন মেয়েটিকে বলতে পারিনি, আমরা— হিন্দুরা তো বুদ্ধকে দশম অবতার করে, ভগবানের আসনে বসিয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করে নিয়েছি, তাই বৌদ্ধ ধর্ম আর ভারতে প্রাসঙ্গিক থাকে নি।

আজ মোদিও তাই করছেন। গান্ধীকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করে স্বাধীনতা আন্দোলনকে অপ্রাসঙ্গিক করে দিতে চাইছে। মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান, বুদ্ধিস্ট এসেছে বৌদ্ধগয়া দেখতে। সফি কুরেসি বিহারের রাজ্যপাল, তাঁর সঙ্গে গেছে। ফিরতি পথে তিনি বললেন, "আচ্ছা, মিস্টার কুরেসি, তুমি বল'তো, যে দেশে ধর্মটা জন্মাল, সেদেশে ধর্মটা আজকে কেন নেই, আর আমরা কোটি কোটি মানুষ এই ধর্মটাকে পালন করছি। সফি কুরেসি বললেন, 'মঝহব হমারে লিয়ে সুরজ কি তহ্‌রা হ্যায় / যব পশ্চিম মে ঢলতা হ্যায় তো পুরব মে জাগতা হ্যায়। হমারে ইহা ঢল গিয়া, তভি তুমহারে উহা জাগ উঠা। লেকিন ধরম বরকরার হ্যায়।" এটাই যদি হয়ে থাকে, তবে কেন আজকেও বলা হবে, "ইসলাম বাইরে থেকে এসেছে! বাবর তো ফিরে যায়নি। দেশ জয় করতে এসে দেশবাসী হয়ে গিয়েছিলেন। এখানে থেকেই শাসন করেছেন। হুমায়ুন তো ফিরে যায়নি। এবং আকবর কবীর, দাদ্দু— তাঁদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে যে 'দীন ই ইলাহি' প্রচার করেছেন, তা যদি এ দেশের ধর্মে পরিণত হ'ত, কোনও দাঙ্গা আর ভারতবর্ষে হ'ত না।

এই পটভূমিকায় যখন আরএসএস-এর নাথুরাম গডসের উত্তরসুরীরা প্রথমে চশমা চুরি করে পরবর্তীতে গোটা মানুষটাকেই চুরি করার চেষ্টা করছে, তাদের জানা উচিত, একমাস রোজা না রাখলে ইদ করা যায় না, ৪০ দিন সংযম না করলে শবরীমালায় যাওয়া যায় না, সারাদিন উপোস না করলে মা কালীকে অঞ্জলি দেওয়া যায় না, আর যার হাতে গান্ধীর রক্ত লেগে আছে, তার হাত থেকে গান্ধী পূজা গ্রহণ করে না।

রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে বলি,

"একদিন যারা মেরেছিল তারে গিয়ে
রাজার দোহাই দিয়ে
এ যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি
মন্দিরে সব এসেছে ভক্ত সাজি।"

গান্ধীকে যারা বলেন, প্রতিবিপ্লবী, আবেদন নিবেদন করে বিপ্লবের বাতাবরণকে শেষ করে দিয়েছিলেন, সেই মানুষটিকে উদ্দেশ্য করে একজন লিখেছেন—

"তোমাকে পেয়েছি অনেক মৃত্যু উত্তরণের শেষে
তোমাকে গড়বো প্রাচীর, ধ্বংস বিদীর্ণ এই দেশে
দিকদিগন্তে প্রসারিত হাতে তুমি যে পাঠালে ডাক
তাই তো আজকে গ্রাম ও শহরে বন্দিত লাখে লাখ।"

এটাই বিপ্লবী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বাঙালি জঙ্গিদের আত্মসমর্পণ কি স্রেফ নাটক?

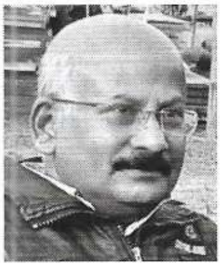

সমর দেব

২৩ জানুয়ারি অসমের রাজধানী গুয়াহাটিতে এক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের মোট ৬৪৪ জঙ্গি অস্ত্রশস্ত্র সহ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের উপস্থিতিতে আত্মসমর্পণ করলেন। এই আত্মসমর্পিত জঙ্গিদের মধ্যে ছিলেন তিন সংগঠনের সদস্যরা। আদিবাসী ড্রাগন ফাইটারের ১৭৮ জন, ন্যাশনাল সাঁওতাল লিবারেশন আর্মির ৮৭ জন এবং সবচেয়ে বেশি ছিলেন ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব বেঙ্গলির (এনএলএফবি) ৩০১ জন আত্মগোপনকারী জঙ্গি। আত্মসমর্পিত জঙ্গিদের মধ্যে ছিলেন এনডিএফবির একটি গোষ্ঠীর আট সদস্য ছাড়াও আলফার (স্বাধীন) পঞ্চাশজন, রাভা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসমের ১৩ জন, কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশনের ছয়জন এবং কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার (মাওবাদী) একজনও। তাঁরা প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্রও তুলে দেন সরকারের হাতে। যেসব অস্ত্রশস্ত্র তাঁরা আত্মসমর্পণের সময় তুলে দিয়েছেন তার মধ্যে ছিল ১৭৭টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৭১টি বোমা এবং ৫২টি হ্যান্ড গ্রেনেড। এভাবে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতে তাঁরা ফিরে এসেছেন। এনএলএফবির নেতা অমর পাল আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বলেন, 'অসমে বাঙালিদের হয়রানি'র অবসান ঘটাতেই তাঁরা অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর সংগঠনের পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে ৭৫টি আগ্নেয়াস্ত্র, ১.৯৩ কিলোগ্রাম বিস্ফোরক।

এই ঘটনায় রাজ্য সরকার এবং পুলিশ প্রশাসন স্বভাবতই অত্যন্ত খুশি। রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল ভাস্করজ্যোতি মহন্ত বলেন, 'এত বিপুল সংখ্যক জঙ্গির আত্মসমর্পণ করে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসার এই দিনটি অসম পুলিশ এবং রাজ্যের পক্ষেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ'। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসায় আত্মসমর্পিত জঙ্গিদের ভূয়সী প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। দেশের স্বার্থে তাঁদের জীবন উৎসর্গের জন্য তিনি জঙ্গিদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শান্তি ছাড়া উন্নয়ন অসম্ভব। শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে। দেশ ও সমাজ গঠনে জঙ্গিদের সক্ষমতাকে কাজে লাগানোর জন্য তাদের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ নেবার জন্য আহ্বান জানান তিনি।

আত্মসমর্পিত জঙ্গিদের পুনর্বাসনের জন্য অসমে কর্মসূচি রয়েছে। প্রাক্তন জঙ্গিদের নানা ভাবে সরকারি সহায়তা করা হয়ে থাকে। তাঁদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। চাইলে ব্যবসা বাণিজ্য করতে তাঁদের ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থাও করা হবে। পুনর্বাসন প্যাকেজ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে একটি বিশেষ কমিটি। এই কমিটিতে থাকছেন প্রশাসন, পুলিশ, সেনা বাহিনী এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার প্রতিনিধিরা। রিপোর্ট আছে, কখনই জঙ্গি ছিল না এমন লোকজনও আত্মসমর্পিত জঙ্গি সেজে সরকারি সুবিধা আদায়ে নেমেছে। এদিনের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরেই আলফা (স্বাধীন) প্রধান পরেশ বরুয়া এক বিবৃতিতে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানকে 'নাটক' বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'এটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। আগে আত্মসমর্পণ করা জঙ্গিদেরই ফের আত্মসমর্পণ করানো হল। এধরনের প্রদর্শনের মাধ্যমে সরকার আমাদের দুর্বল করতে চাইছে, তবে তারা কখনই একাজে সফল হবে না। বরং আলফা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে'।

আত্মসমর্পণের এই ঘটনায় নানা মহল থেকেই সমালোচনার ঝড় উঠেছে। সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে তথাকথিত ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব বেঙ্গলি (এনএলএফবি) নামের সংগঠনটি সম্পর্কে। কেন্দ্র এবং অসমে ক্ষমতাসীন বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার নানা কারণেই দেশজুড়ে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে। নেতা-মন্ত্রীদের নানা ধরনের প্ররোচনামূলক বক্তব্য ছাড়াও খোদ দেশের সংবিধানকেই তারা চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছে বলে সমালোচনার ঝড় বয়ে চলেছে। এধরনের সমালোচনা শুধু দেশেই সীমাবদ্ধ নেই, বিদেশে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জেও উঠে এসেছে বিষয়টি। বিশেষ করে এনআরসি এবং নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী আইন (সিএএ) নিয়ে সারা দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছে। রাজধানী দিল্লির বুকে চলছে তীব্র প্রতিবাদী বিক্ষোভ। ইতিমধ্যেই বিক্ষোভ দেড় মাস অতিক্রম করেছে। সরকারি স্তরে প্রতিরোধ মোকাবিলায় প্রায় সর্বত্রই চলছে দমনমূলক কার্যকলাপ। সরকার, প্রশাসন যত প্রবল চাপে সমালোচনা, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ দমিয়ে দিতে চাইছে, ততই প্রবল হয়ে উঠছে প্রতিবাদ বিক্ষোভ।

অসমে আগে থেকেই ভূমিপুত্রদের অধিকার নিয়ে তীব্র সচেতনতা রয়েছে। স্থানীয় ভূমিপুত্রদের

ভাষা, সংস্কৃতি, অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ছে বলে আশঙ্কার প্রেক্ষিতে দীর্ঘকালের প্রতিবাদী আন্দোলনের অতীত রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে ১৯৭৯ সালে শুরু হওয়া বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলন দীর্ঘ ছ'বছর ধরে চলে। ১৯৮৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর উদ্যোগে ঐতিহাসিক অসম চুক্তি স্বাক্ষরের পর সেই উত্তাল আন্দোলনের অবসান ঘটেছিল। তারপর দীর্ঘকাল অনেকটাই শান্ত হয়ে এসেছিল অসম এবং শান্তির বাতাবরণে দ্রুত উন্নয়নের পথে হাঁটছিল রাজ্যটি। তবে, অসম চুক্তির পরও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল সন্ত্রাসবাদ। আলফা সহ অনেকগুলি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের কার্যকলাপে সমগ্র অসম দীর্ঘকাল অস্থির, অশান্ত ছিল। পরে কয়েক বছরে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রচেষ্টায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রশমিত হয়ে আসে। কয়েক দশকে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের বহু জঙ্গি আত্মসমর্পণ করে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসেন।

তবে, আত্মসমর্পিত জঙ্গিদের একাংশ সমাজজীবনে ফিরে এলেও নানা সহিংস কার্যকলাপও চালিয়ে যাচ্ছিল। অন্যদিকে, আলফা এবং এনডিএফবির মতো সংগঠনের নানা গোষ্ঠী যথারীতি তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে গেছে। অসম চুক্তির প্রেক্ষিতে সম্প্রতি অসমে জাতীয় নাগরিক পঞ্জির নবায়ন নিয়ে নতুন করে উত্তেজনা দেখা দেয়। রাজ্যের তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ বাসিন্দার মধ্যে প্রায় উনিশ লক্ষ বাসিন্দার নাম বাদ পড়ে এনআরসি তালিকা থেকে। এদের মধ্যে প্রায় ১৪ লক্ষ বাঙালি হিন্দু বলে জানা গেছে। তাছাড়াও এই বাদের তালিকায় রয়েছে লক্ষাধিক গোর্খা। একাংশ বাঙালি হিন্দু, স্থানীয় ভূমিপুত্রও তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। গোর্খারা জানিয়ে দিয়েছে তারা নাগরিকত্ব চেয়ে নতুন করে আবেদন করবে না। আবার, স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠন মতপ্রকাশ করে যে, মাত্র উনিশ লক্ষই নয়, আরও বহু 'বিদেশী'র নাম এনআরসি তালিকায় উঠেছে। এদের নাম বাদ দিতে হবে। অসমে বিজেপির ক্ষমতাসীন হবার পেছনে সক্রিয় ছিল বিরাট সংখ্যক হিন্দু বাঙালি। এনআরসি তালিকা থেকে এদের নাম বাদ পড়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়ে যায় মূলত বিজেপি। কারণ, তারা খোলামেলাই দাবি করে আসছে যে, বাঙালি হিন্দু নয়, বাদ দেওয়া হবে বাঙালি মুসলিমদের, যারা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী। এনআরসি তালিকা থেকে মুসলিমদের বাদ দেবার কথা বারবার বলা হলেও বাস্তবে তাদের সিংহভাগেরই নাম উঠে গেছে তালিকায়। উল্টে বাদ পড়েছে বিরাট সংখ্যক বাঙালি হিন্দুর নাম। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় তড়িঘড়ি পাশ করানো হয় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। বিলটি পরিণত হয় আইনে। তারপরই ফের উত্তাল হয়ে ওঠে সারা দেশের সঙ্গে অসমও। সারা দেশে আপত্তি ওঠে এই কারণে যে, আইনটি সরাসরি সংবিধান বিরোধী। আইনটি সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতাকে লঙ্ঘন করেছে। কিন্তু, অসমে আপত্তি ওঠে অন্য কারণে। অসমের স্থানীয় সংগঠন এবং স্থানীয় ভূমিপুত্ররা অভিযোগ করেন যে, এই আইনটির বাস্তবায়নে অসমিয়া সংস্কৃতি, অসমিয়া ভাষা, অসমিয়ার অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। প্রতিবাদ এমন জোরালো হয়ে উঠেছে যে, আইনটি সরকার শেষ অবধি বাস্তবায়ন করতে পারবে কিনা তা নিয়েই সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে উন্নয়নহীনতা এবং সেই সঙ্গে এই গুরুতর জটিলতা থেকে বেরিয়ে আসার পথ পাচ্ছে না সরকার। এই প্রেক্ষিতেই বাঙালি জঙ্গি সংগঠনের আত্মসমর্পণের এই নাটক করা হচ্ছে বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

একাধিক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, আত্মসমর্পণ করেছে এমন অনেকেই যারা মজুরি শ্রমিক, ছোট ব্যবসায়ী ইত্যাদি। যোসব এলাকার বাসিন্দা তারা সেখানকার লোকজনই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, এরা কখনই আত্মগোপন করে নি। নিয়মিত এদের দেখা গেছে এলাকায়। ফলে আত্মসমর্পণের প্রশ্নই ওঠে না।

আরেকটি কথা এপ্রসঙ্গে বলা যায়, তা হলো, বাঙালি এই তথাকথিত জঙ্গি সংগঠনের নামই এর আগে কেউ শোনে নি। হঠাৎ করে উদয় হয়েছে এমন এক জঙ্গি সংগঠনের যার নামও আগে শোনা যায় নি, তাদের কোনও কার্যকলাপের খবরও আগে পাওয়া যায় নি। ফলে বিষয়টি নিয়ে রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন অনেকে। এই পরিস্থিতিতে এই রহস্য ভেদের দায় সরকারের। কবে কখন কোথায় ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব বেঙ্গলির (এনএলএফবি) জন্ম হল সে এক জরুরি প্রশ্ন। তারা কবে কোথায় কী ধরনের কার্যকলাপ চালাল সেসবও অজ্ঞাত। যে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র তারা সরকারের হাতে তুলে দিল সেসব তারা পেল কবে, কোথায়, কীভাবে সেসবও জটিল প্রশ্ন। এসব প্রশ্নের জবাব পেতে হলে হয়ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। সরকার কোণঠাসা অবস্থায় বলেই হয়ত এসব প্রশ্ন বেশি করে উঠে আসছে।

এ নদী কেমন নদী

উত্তর দিনাজপুরে নদী নিয়ে কাজের কাজ কিছু হয়েছে কি?

তুহিন শুভ্র মন্ডল

এই লেখা যখন লিখছি তখন সদ্য শেষ হয়েছে তখন ডুয়ার্স আয়োজিত প্রথম ডুয়ার্স সাহিত্য উৎসব মূর্তি নদীর পারে। তখন থেকেই মনের ভিতর এই লেখা তৈরি হচ্ছিল। গত সংখ্যায় লিখেছিলাম দক্ষিণ দিনাজপুরের নদীর কথা নিয়ে। এবার উত্তর দিনাজপুর। উত্তর দিনাজপুরও তো নদীর জেলা। বেশ কয়েকটি নদীই এখানে আছে। কুলিক, নাগর,শ্রীমতি, সুধানী, সুই, মহানন্দা, টাঙ্গন, গামারি, গোবরা, ডাহুক, ফুলহার, নোনা, গন্দর, বেরং দলঞ্চা, সুধা পিতানি, কাহালাই, রাক্ষসিনী-তেঁতুলিয়া, ভেরসা ইত্যাদি। বলা যেতে পারে উত্তর দিনাজপুর আক্ষরিক অর্থেই নদী বিধৌত। কেমন আছে সেখানকার নদীরা?
সেখানকার মানুষের ভাবনাই বা কি? প্রশাসন কি বলছে? নদী পুনরুজ্জীবনে কী কী পরিকল্পনার কথা ভাবছে সরকার? আসুন একটু ঘুরে দেখা যাক নদীপথ ধরে।

উত্তর দিনাজপুরের নদীগুলির মধ্যে প্রথম পরিচিত হতে শুরু করি শ্রীমতি ও কুলিকের সাথে। সাল- ১৯৯৫। জেলার বাইরে প্রথম পদার্পণ। তখন শিলিগুড়ি কলেজের ভূগোল বিভাগে ভর্তি হয়েছি। প্রথম দিকে দিনের গাড়িতেই যাওয়া আসা করতাম। সেই সময়েই রাস্তায় শ্রীমতি আর কুলিকের সাথে দেখা বাসের জানালা দিয়ে। নদী বলতে যে প্রশস্তা বুঝি, তা সেইসময় থেকেই দেখতে পাইনি। কিন্তু তখন ছিল শুধু নদীকে দেখা। তার ভিতরে কোন প্রাণ ছিল না। ছিল না কোন নদী চেতনা। ২০১৬ সালে রায়গঞ্জের একটি নাট্য দলের আমন্ত্রণে পরিবেশ দিবসে কুলিক বাঁচাও অভিযানের ডাক দিয়েছিল তারা।

কুলিক বাঁচাও অভিযান

একটি নদীর জন্য পদযাত্রা। ততদিনে আত্রেয়ীর কথা, আত্রেয়ী বাঁচাও আন্দোলনের কথা বহুভাবে প্রকাশিত। রায়গঞ্জ শহরের রাস্তায় নদীর হাত ধরে নেমে পড়লো পরিবেশ কর্মী, নাট্যকর্মী, গায়ক, লেখক, সচেতন মানুষ, পড়ুয়ারা। তারপর গান্ধীমূর্তির পাদদেশে কুলিক নদী নিয়ে সচেতনতা সভা। প্রায় একুশ বছর ধরে দেখা, নদীটার যন্ত্রণার কথা, কষ্টের কথা তুলে ধরা হল। বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁ থেকে উৎপত্তি লাভ করা এই নদীর দৈর্ঘ্য ৫৮ কিলোমিটার এবং গড় প্রস্থ ৬০ কিলোমিটার। পরপরউঠে এল কুলিক নদীর নাব্যতা হ্রাসের কথা হারিয়ে যাওয়া 'মাছের কথা, জল না থাকার কথা, জল দূষণের কথা, নদী তীরবর্তী জমিতে রাসায়নিক সার দ্বারা চাষের কথা, ইত্যাদি। তার পরেও ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের নদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে নদীর কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল জাগরী থিয়েটার গ্রুপ। তার আগেও রায়গঞ্জের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন নাগরিক কুলিক নদী বাঁচাও কমিটি এইচ এম চি এ, পি এফ এ-র মত পরিবেশ প্রেমী সংগঠন রায়গঞ্জের লাইফলাইন কুলিক নদী বাঁচানোর কথা বলেছে। খরমজাঘাট, ফরেস্ট মোড়ের বাসিন্দাদের সাথে নিজে কথা বলে দেখেছি যে নদীর জন্য তারাও চিন্তা করেন। তাদের চোখে জল দেখেছি কুলিকের জন্য।

কুলিক রেজুভিনেশন প্রকল্প

কুলিক নদী বাঁচার জন্য পরিবেশকর্মী, পরিবেশপ্রেমী সংস্থা, সচেতন জনগণদের লাগাতার প্রচেষ্টায় উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনও উদ্যোগী হয়েছিল কুলিক পুনরুজ্জীবন প্রকল্প গ্রহণ করতে। কুলিক নদী পাড়ে যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি অবস্থিত তাদের নিয়ে। আলোচনাসভা হয়েছিল কুলিক পুনরুজ্জীবন প্রকল্পের জন্য একটি বিশেষ লোগো প্রকাশ করেছিল উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। কাজও শুরু হয়েছিল। এটা দু-আড়াই বছর আগের কথা বলছি। কিন্তু তারপর? কাজের কাজ কিছু এগোয়নি। এখন আর সে নিয়ে কোন কথা শোনা যায়না। তবে মানুষজন এখনও আশায় রয়েছে যে, কুলিক পুনরুজীবন প্রকল্পে কুলিক নদী বাঁচবে।

কেমন আছে শ্রীমতি? নদী তো নয়- এতা জমি

একথা বললে একটুও ভুল হবে না যে উত্তর দিনাজপুরের নদীগুলির মধ্যে সবচাইতে খারাপ অবস্থা যদি কোন নদীর থাকে তাহলে তার নাম শ্রীমতি। নদীই তো নেই। শ্রীমতি নদী প্রবাহিত হত এমন বেশকিছু জায়গা আছে (যেমন কালিয়াগঞ্জ কলেজের কাছে দাশিয়া) যেখান কোনও নদী নেই। পুরো ধানক্ষেত। কাউকে যদি বলে না দেওয়া হয় যে, এখানে নদী ছিল তাহলে বোঝা সম্ভবই নয়। নদীখাতে মানুষের নিজের নামে জমি রয়েছে। এটা কি সম্ভব? এটা কি করে হয়? শ্রীমতির নদীখাতে প্রচুর মানুষের নিজেদের জমি রয়েছে। শ্রীমতি নদী সংস্কারের জন্য এর আগে দরবার করেছে কালিয়াগঞ্জের শ্রীমতি নদী বাঁচাও কমিটি, কালিয়াগঞ্জ নদী ও পরিবেশ বাঁচাও কমিটি। হয়েছে আলোচনাসভা প্রশাসনের কাছে দরবার। তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে উত্তর দিনাজপুরের জেলা প্রশাসন ব্লক প্রশাসনকে নির্দেশ দেয় শ্রীমতি নদী সংস্কারের। কিন্তু প্রশাসন গিয়ে কাজ করতে পারেন। কারণ নদীই তো নেই। মানুষের জমি সেটা। অথচ সেটা একসময় নদী ছিল। কি অদ্ভুত! সম্প্রতি ব্লক প্রশাসন, পৌরসভা রাজ্যসরকারের সেচ দফতরের কাছে প্রস্তাব দিয়েছে শ্রীমতি নদী সংস্কারের। কিন্তু কাজ কতদূর হবে- এ নিয়ে আশংকা করছেন সাংবাদিক ও নদী কর্মী তপন চক্রবর্ত্তী।

কোথায় গেল মাছেরা?

কোথায় গেল কুলিকের মাছ? স্থানীয়দের মতে একসময় কুলিক নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত।

নাগর নদী

এখন সেসব কোথায়? মাছ ধরে যারা জীবিকা নির্বাহ করতো, তারাও তো সঙ্কটে। তাদের জীবন তো অন্ধকারময়। নদী ভাল না থাকলে যারা সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তারা মৎস্যজীবী। তাদের কথা ভাবা হচ্ছে না। তাদের কর্মসংস্থান পরিবার। নদী ভাল না থাকলে যে একটা বৃহৎ আর্থ-সামাজিক সঙ্কট তৈরি হয় তার খোঁজ কেউ রাখছেনা। তাই পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছেনা সেভাবে। কোথায় গেল উত্তর দিনাজপুরের নদিতে পাওয়া যাওয়া আগের মাছ? ট্যাংরা, কাঁকলা, পুটি, ময়া, কাল বাটা, খলসে মাছ, বাচা, বাইম, বেলে, কুচে, পাথর চাটা? ব্যাপক পরিমান দেখা যেত আগে। আর এখন? কোথায় সে সব? শ্রীমতি নদীতে আগে বিখ্যাত ছিল বোয়াল। শ্রীমতির বোয়ালের নাম ছিল সুবিদিত। এছাড়াও পুঁটি, বাইম- প্রচুর পরিমান পাওয়া যেত। এখন সেসব অতীত। উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রায়গঞ্জের সুরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক পৃথ্বীরাজ ঝাঁ। তিনি বলেন 'নদী ভাল না থাকলে মাছ কিভাবে থাকবে?' তাই ঐতিহ্যের ছিরামতি এখন হাহাকারের শ্রীমতি নদীতে পর্যবসিত।

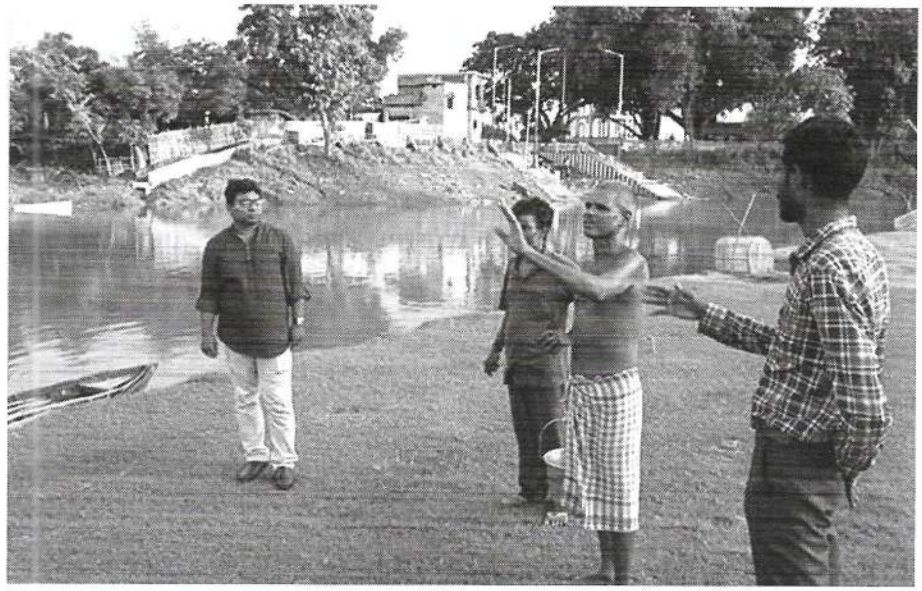

কুলীক নদীর পাড়ে দুর্দশার কথা জানাচ্ছেন খুরমুজা ঘাটের বাসিন্দারা

কী অবস্থা অন্য সব নদীর?

মহানন্দা নদীর এক অংশ উত্তর দিনাজপুর জেলা দিয়ে প্রবাহিত। অবস্থা ভয়ংকর। সুদানী, সুই? অবস্থা দুর্বিষহ। নাগর? এই নদীতে উত্তর দিনাজপুরের মধ্যে সব নদীর চেয়ে বেশি জল থাকত। কিন্তু আজ এই নাগর নদীতেও বর্ষার সময় ছাড়া জল নেই। কেন হচ্ছে না নদীমুখী পরিকল্পনা? প্রশ্ন উঠছে উত্তর দিনাজপুরের নদীগুলির ক্ষেত্রে নদীগুলিকে মানুষ ব্যবহার করতো বিভিন্নভাবে। সেসব দিন গিয়েছে। এখন উপরের নদীগুলি আর আগের অবস্থায় নেই। তাই বাঁচাতে পরিকল্পনা জরুরী দ্রুত। নাগর নদীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চর হয়ে গিয়েছে। একটা দ্বীপের মত। প্রশাসনের ভাবনা কি?

দেখে মনে হচ্ছে চাষের জমি, আদতে এটি কালিয়াগঞ্জের শ্রীমতি নদী

নদীতে আর আগের মত ভাসা যায় না

এই আক্ষেপ কেশব আর মাধবের। অর্থাৎ প্রকৃতি বন্ধু সুদর্শন ব্রহ্মচারী এবং সুকুমার বারই- এর। সময় হলেই নদী দেখা, নদীতে ভাসা তাদের প্রিয় শখ তাই নদীকে তারা কাছ থেকে দেখেন। নদীরভাঙা-গড়া, নদীর দখল, নদীর দূষণ, অবাধ বালি উত্তোলন নদীর বুকে রাসায়নিক সার দ্বারা চাষবাস, নদীর পাশেই ইটভাটার জন্য নদীবক্ষ থেকে মাটি তুলে নেওয়া নদীর পাশের ঘাটাল সব তারা কাছ দেখে দেখেন। মাঝিদের কাছ থেকে নদীর গল্প শোনেন। তাই তারা অনুভব করেন নদী ভাল নেই, নদীতে আর আগের মত জল নেই। আক্ষেপ করেন সুদর্শন ব্রহ্মচারী আর সুকুমার বারই। নদীতে আর আগের মত ভাসা যায় না।

নদীকে ভাল রাখতে পড়ুয়াদের অংশগ্রহণ

রায়গঞ্জের জাগরী থিয়েটার এর আগে নদীর জন্য যে কর্মসূচি নিয়েছিল তাতে স্কুল পড়ুয়ারা নদীর জন্য এঁকেছিল। নদীর পাড় ধরে সেই সচেতনতা অভিযানে অংশ নিয়েছিল তারা কুলিক নদীর প্রতীকি সাফাই অভিযানেও বড়দের সাথে অংশ নিয়েছিল তারা। যেহেতু তারাই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। তাই নদী ও পরিবেশ রক্ষায় স্কুল ও কলেজ পড়ুয়াদের অংশগ্রহণ খুব জরুরী। নদী ও পরিবেশ বিষয়ে যে সমস্ত সংঘঠন কাজ করে তারাও এই বিষয়টা উপলব্ধি করছেন।

নদীর জন্য পৌরসভার উদ্যোগ কি?

কুলিক নদীর ব্রীজের নীচে মাছ নিয়ে আসা ট্রাকেরা থার্মোকলের বাক্সগুলো নদীতে ফেলতো। ট্রাক ধুতো। এসবের ফলে নদী দূষণ হয়। শহরের বুক দিয়ে তো বয়ে গিয়েছে কুলিক শ্রীমতি। কি করছে পৌরসভা? রায়গঞ্জ পৌরসভার পক্ষ থেকে থার্মোকল জনিত কুলিক দূষণ প্রতিহত করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শ্রীমতি নদী নিয়েও বার কয়েক বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করে নদীকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে কালিয়াগঞ্জ পৌরসভা। পরিকল্পনা পাঠাচ্ছে রাজ্য সরকারের কাছে। অপরপক্ষে কেউ কেউ বলছেন শ্রীমতি নদীর বুকে কেন সুইমিং পুল করছে পৌরসভা? এটা কী করে সম্ভব?

উত্তর দিনাজপুর নদী ও পরিবেশ সুরক্ষা সমিতি

উত্তর দিনাজপুরের নদী ও পরিবেশ প্রেমী সংগঠন গুলিকে একত্রিত করার উদ্যোগ নিয়েছে সবুজ মঞ্চের উদ্যোগে গঠিত রাজ্য নদী বাঁচাও কমিটি। তারজন্য রায়গঞ্জ সহ উত্তর দিনাজপুরের নদী ও পরিবেশ কর্মীদের নিয়ে মিটিং হয়েছে, গঠিত হয়েছে উত্তর দিনাজপুর নদী ও পরিবেশ সুরক্ষা সমিতি। শিলিগুড়ির মহকুমা পরিষদ সভাকক্ষে প্রথম উত্তরবঙ্গ নদী ও জলাভূমি বাঁচাও কনভেনশনে তারা তুলে ধরেছে উত্তর দিনাজপুরের নদী ও নদী নির্ভর মানুষদের জীবনের সমস্যা। সেই কমিটির পক্ষে গৌতম কান্তিরা, শংকর ধর, কৌশিক ভট্টাচার্য, চন্দ্রনারায়ণ সাহা, গোপাল মিত্র প্রমুখরা বলেন- 'নদী গুলিকে বাঁচানোর জন্য আমরা পৌরসভা, প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহন চাইছি। নদীগুলিকে যে কোনও মূল্যেই বাঁচানো দরকার।'

দক্ষিণ দিনাজপুরের মত উত্তর দিনাজপুরের নদীগুলোও সমস্যাদীর্ণ। ভবিষ্যতকে বাঁচাতে সেই নদীগুলিকে বাঁচানো দরকার। তবেই তো বাঁচবে পরিবেশ, বাঁচবে, ভবিষ্যত। বেঁচে থাকবে ভবিষ্যত প্রজন্ম।

প্রথম ডুয়ার্স সফল সাহিত্য উৎসব

রাত তখন দেড়টা। মুর্তির তীরে গোটা ধুপঝোড়া গ্রাম জানুয়ারির শীতে কাতর, নিথর। ওপারের গহীন অন্ধকারে কুয়াশায় হারিয়ে গিয়েছে গরুমারার জঙ্গল। গাঁয়ের কুকুর বা রাতচরা পাখিরও কোনও আওয়াজ মেলে না, এমনই সে নিশুতি রাত। হঠাৎ কোত্থেকে শুরু হল বৃষ্টি। টিপ টিপ থেকে ঝিরি ঝিরি। চোখের সামনে তাপমান নেমে গেল নয় থেকে ছয়ে। জয়ন্ত-দীপকদা শুয়ে পড়লেও শুভ্র আপত্তি তুলল, এমন একটা রাত বসে বসে খানিক দেখব না? ঘুমিয়ে পড়ব?

কথাখান ঠিকে কইছেন ভাইও। চল তবে একটু পায়চারি করে আসি।

কিন্তু বাস্তবে তারপর ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে বারান্দায় বসে আমরা দুজনে আবার মৌন পাথরস্তব্ধ হয়ে গেলাম।

কতক্ষণ জানি না, হঠাৎ শুভ্রকে অস্ফুটে বলতে শুনলাম, এ উৎসব সফল না হয়ে যায় না!

পরদিন এখানেই সকালে শুরু প্রথম ডুয়ার্স সাহিত্য উৎসবের। নদীর ধারে খোলা আকাশের নীচে মঞ্চ মাইক নিয়ে কবিতা পিকনিক। অভিনবত্বে রোমাঞ্চে ভরপুর আগত প্রতিনিধির সংখ্যা যখন একশ ছাড়িয়ে গেল, শুভ্রকে পাশে এসে ফের বলতে শুনলাম, এ উৎসব কখনও সফল না হয়ে যায়?

কেউ বলছে মোচ্ছব। কেউ বলছে জমিদারের বেড়ালের বিয়ে। কারো কারো সন্দেহ গোপন রাজনৈতিক ফান্ডিং। ভাবনাগুলি অস্বাভাবিক নয়। কারণ উত্তরের সাহিত্য নিয়ে এত বড় উৎসব উদ্দীপনা সম্ভবত আজ পর্যন্ত হয় নি। দুদিনে তিনটে জায়গায় শ দুয়েক কবি-সাহিত্যিক-সাহিত্যপ্রেমীর জমায়েত ও আরো অনেক অনেক পাঠকের অংশগ্রহণ, কলকাতা থেকে রণজিৎ দাশ, সুধীর দত্ত, ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বাংলা সাহিত্যের দিকপাল কিংবা পার্থজিৎ চন্দ ও দক্ষিণের একঝাঁক কবির স্বতস্ফূর্ত নিঃশর্ত যোগদান, বিমল লামার পুরুলিয়া থেকে গাড়ি চালিয়ে চলে আসা, সাগরিকা রায় গৌতমেন্দু রায়, সুজিত দাস সুমন ভট্টাচার্য বুবুন চট্টোপাধ্যায়ের মত শুভানুধ্যায়ীদের পাশে থাকা, সবটাই ঘটেছে একসঙ্গে, সবটাই অবিশ্বাস্য সত্যি।

প্রথম ডুয়ার্স সাহিত্য উৎসবে হিরো নিঃসন্দেহে প্রথম দিনের ধুপঝোরা। ঝলমলে কড়া রোদ মাথায় পিঠে মেখে দিনভর কবিতা পাঠ, সন্ধ্যায় মনোরম গদ্য আসরে গল্প পাঠ, আদিবাসী নাচ ও ক্যাম্প ফায়ার, মুর্তি-মাদল জিতে নিয়েছিল পুরো উৎসব। পরদিনের অনুষ্ঠান আরও বিস্তৃত। একদিকে জলপাইগুড়ির রবীন্দ্রভবনে রণজিৎ দাসের কবিতা পাঠ। অতিথিদের আলোচনা সভায় অংশ নেনসাহিত্যিক-প্রকাশক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা প্রস্তুতির শেষলগ্নে চব্বিশটি ঘন্টা বের করেছিলেন এই উৎসবের জন্য। তারপর কবি সম্মেলন ও সন্ধ্যায় ছোটদের বই প্রকাশ ও পাপেট শো। অন্যদিকে শিলিগুড়ির ইচ্ছেবাড়িতে বিকেল থেকে বসেছিল সাহিত্যবাসর, তরাই অধ্যায়।

বন্ধুর হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন শিলিগুড়ি ইচ্ছেবাড়ির অভয়া বসু, যাঁকে ছাড়া উৎসবের তরাই অধ্যায় সম্ভব ছিল না, সঙ্গে ছিলেন আগাগোড়া।

কবিতা পাঠে সেবন্তী ঘোষ, উত্তম দত্ত ও সুজিত দাস

দিনভর কবিতা পিকনিক উপভোগ করলেন বিপুল দাস

সন্ধের আসর লোকগীতির মিষ্টি সুরে মাতালেন পীযুষ সরকার

মুর্তি নদীর ধারে ধুপঝোরা সাউথ পার্ক রিসর্টের আঙ্গিনায় সূচনা হল প্রথম ডুয়ার্স সাহিত্য উৎসবের

জলপাইগুড়ি রবীন্দ্র ভবনে মঞ্চে হাজির সাগরিকা রায়, সুজিত দাস, রণজিৎ দাশ, সুধীর দত্ত, বিমল লামা, বুবুন চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, সুমন ভট্টাচার্য ও পার্থজিৎ চন্দ

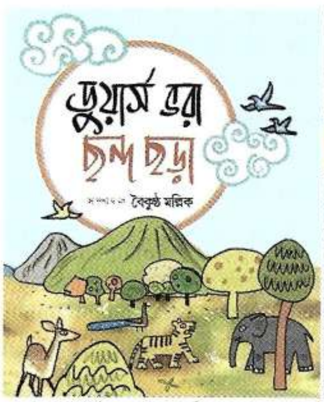

(ওপরে) ছোটদের 'ডুয়ার্স ভরা ছন্দ ছড়া' বইটি প্রকাশ করলেন সুমন ভট্টাচার্য
(নিচে) শিলিগুড়ি ইচ্ছেবাড়িতে সাহিত্য বাসর

সবার বড়দা বিপুল দাস উৎসবের সূচনা করেছেন, দুর্বল শরীর তাঁকে সারাদিন ক্লান্ত করতে পারে নি। 'এখন ডুয়ার্স' এখনও কবিতা ছাপে না। তবু ভালোবেসে হাজির ছিলেন উত্তরের কবি তারকারা। উত্তম দত্ত, সেবন্তী ঘোষ, তনুশ্রী পাল, সপ্তাশ্ব ভৌমিক, মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস, সুদীপ্ত মাজি ছিলেন দিনভর। সেবন্তী ঘোষ হাজির ছিলেন দু'দিন-ই। বিজয় দে, সুবীর সরকার, সঞ্জয় সাহা,অনিন্দিতা গুপ্ত রায় দ্বিতীয় দিন তাঁদের উপস্থিতি জানান দিয়েছেন। আর যেসব কবিদের নাম একডাকে উঠে আসে তাঁরা সবাই এসেছেন। প্রত্যন্ত বালুরঘাটের তুহিনশুভ্র মণ্ডল বা দিনহাটার অভিজিৎ দাশ-হরিপদ রায়ের মত 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার নিয়মিত লেখকেরা উপস্থিত ছিলেন। তরুণদের উচ্ছাস ও ভালবাসা নিয়ে আলাদা করে বলার কিছু নেই, তাঁরাই উৎসবের অক্সিজেন যোগানদার। মৃগাঙ্ক ও সত্যম ভট্টাচার্য লড়ে গেছে শুরু থেকে শেষ অব্দি। গৌতম ও মনোনীতা চক্রবর্তীর দায়িত্ব পালন মনে রাখবার মত। সেই মুর্শিদাবাদ থেকে ছোট্ট মেয়েকে রেখে একা ছুটে এসেছিল হিমি মিত্র রায়, আর মাস কয়েকের যমজ শিশুকে রেখে হলদিবাড়ি থেকে শাঁওলি দে। গুয়াহাটি থেকে এক ডাকে এসেছিলেন সমর দেব। আরও কত কত নাম! সবার নাম ও ছবি সগৌরবে ছাপা হয়েছে স্মরণিকায়, যা বেঁচে থাকবে আগামীর ইতিহাসে।

আমার দুই বন্ধু ও প্রিয় কবি অমিত কুমার দে ও সুজিত দাস। অমিত ঠ্যাং ভেঙে শয্যায় থাকলেও প্রতিমুহূর্তে শুভ কামনা করে গিয়েছে, আর বিশাল কবি বাহিনীকে একা সামলেছে সুজিত। একবারও বুঝতে দেয় নি উৎসবে ও কলকাতার একজন আমন্ত্রিত অতিথি, বরং বুঝিয়েছে সাহিত্য উৎসব ঠিক কীভাবে পালন করা উচিত। আমার দুই প্রিয় ভগিনী সহকারী শ্বেতা সরখেল ও তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। শ্বেতা টাইফয়েডে কাত, ওকে মিস করেছি প্রতি মুহূর্তে, তবু তন্দ্রা একা চেষ্টা করে গেছে আমার মাথা ঠান্ডা রাখার। দুই বিশ্বস্ত অনুচর পুকাই ও সার্থক আমার দুটো হাত হয়ে নিঃশব্দে আদেশ পালন করে গেছে। আমার দুই পুরনো সাথী শুভ্র চট্টোপাধ্যায় ও জয়ন্ত গুহ সঙ্গে ছিল ছায়ার মত। সৃষ্টি মাইম ও সব্যসাচী দত্তের দুই হাত সমানে চলে বলেই জলপাইগুড়ি রবীন্দ্র ভবনের অনুষ্ঠান নিশ্চিন্তে নেমেছে। আর সবশেষে আমার দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু দীপক সামন্ত (ইমেজ অ্যাড) ও তাপস বরণ চন্দ (ধূপঝোরা সাউথ পার্ক), সত্যি কথা বলতে, না থাকলে এই আয়োজন কখনই কখনই সম্ভব হত না। সাহিত্যের প্রতি ও আমার উদ্ভট সব ভাবনার প্রতি এই দুজনের নীরব ও সক্রিয় সমর্থনের কথা পরে কোনওদিন আলাদা করে না হয় বলব!

পাঠক এবার বলুন, সবার শুভেচ্ছা ভালোবাসা থাকলে এরপর এরকম একটা উৎসব কখনও সফল সুপার হিট না হয়ে যায়? কেবল পয়সা ঢাললেই কি সব হয়?

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

উত্তরে হোমস্টে কাহিনি শুরু কিন্তু সেই রাজাভাতখাওয়াতে

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

ডুয়ার্সে প্রথম হোমস্টের সূচনা, ভাবনা, প্রচেষ্টার রূপকার রাজাভাতখাওয়ার তারাশঙ্কর থাপা। বক্সা পাহাড়ে প্রয়াত হরিশঙ্কর থাপার ভাইপো। মনে পড়ে একবার বনবাংলোতে ঘর না পেয়ে চুপচাপ বসে আছি রাজাভাতখাওয়া রেলস্টেশনের সুনশান প্ল্যাটফর্মে। সে সময় অটো, টোটো এসব যানবাহনের চলাচলই ছিল না। ম্যাটাডোর ওরফে মুড়ির টিন দুয়ার থেকে (মানে চৌপথি থেকে) ডিআরএম (চৌপথী) পর্যন্ত। তারপর আপন বাহন না হলে পয়দল, চরৈবেতি। দমনপুরে অবশ্য ছোট একটা স্টেশন ছিল। স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করলাম বনবাংলো ছাড়া মাথা গোঁজার আশ্রয় কিছু আছে কিনা। উনি বললেন, 'আই অ্যাম নট শিওর তবে রেল লাইনের পাশে এক নেপালি যুবক, তারা থাপা নাম, টুরিস্টদের বাড়িতে রাখে। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন। সামান্য একটু হাঁটা পথ। দেখা নয়, গেটের কাছে তারা থাপা দাঁড়ানো। সমস্যার কথা শুনে বলল— 'ওয়েল কাম'। বাকিটুকু দীর্ঘ আতিথেয়তার কাহিনি।

সেই রাজাভাতখাওয়া এখন খুঁজেই পাবেন না। সংসারী হবার পর গিন্নিকে নিয়ে বহুবার এসে তারার আতিথ্যে থাকি খাইদাই, ঘুরে বেড়াই। দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে বাঙালি পরিবারে। স্ত্রী শর্মিলা ও তারা বাংলা চমৎকার বলে, তেমনই বাংলা গান গেয়ে শোনায়। বনবস্তির মানুষজনের সুখ-দুঃখের পাঁচালি।

সেই রাজাভাতখাওয়া এখন খুঁজেই পাবেন না। সংসারী হবার পর গিন্নিকে নিয়ে বহুবার এসে তারার আতিথ্যে থাকি খাইদাই, ঘুরে বেড়াই। দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে বাঙালি পরিবারে। স্ত্রী শর্মিলা ও তারা বাংলা চমৎকার বলে, তেমনই বাংলা গান গেয়ে শোনায়। বনবস্তির মানুষজনের সুখ-দুঃখের পাঁচালি। রাজাভাতখাওয়ার পুরনো দিনের গল্প করতেন গদাই ঘোষ। গদাই ঘোষ আদ্যিকালের কাঠের দোতালা ঘরবাড়ি প্রায় ভ্যানিস।

রাজাভাতখাওয়ার পুরনো দিনের গল্প করতেন গদাই ঘোষ। গদাই ঘোষ আদ্যিকালের কাঠের দোতালা ঘরবাড়ি প্রায় ভ্যানিস। পরবর্তীকালে রাজাভাতখাওয়াতে পরিমল গড়ে তোলে স্টেশনের গা ঘেঁষে মামন ট্রেকার্স হাট। একটু দূরে হামরো হোমের লাল সিং ভুজেলের হোমস্টে। এখন পাহাড় সমতল জুড়ে হোমস্টের ছড়াছড়ি এবং খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ক'দিন আগেই তারার গ্রাসিলিপস হোমস্টেতে মিয়াবিবি পরমানন্দে কাটিয়ে আসি।

আমার প্রিয় কালো নুনিয়া চালের ভাত, আলু, ডিমসেদ্ধ সঙ্গে কাঁচা মরিচ। তারার প্রিয় ব্রেকফাস্ট ফ্যানা ভাত। আরেকটি বস্তু ভাল তৈরি করে তা হল মাশরুমের তরকারি। অনবদ্য।

পরিব্রাজক, চারণিক, পথের সাথী যারা নিত্য চলার পথিক অবশ্যই আসবেন ভুজেল, তারা, পরিমল, রামকুমার লামাদের আদর আপ্যায়নে। রাজাভাতখাওয়াতে টাইগার লজ, লিও লজ, বক্সা জাংগল লজ থেকেছি কিন্তু অন্তরের ভালবাসা পাওয়া যায় হোমস্টেতে। বহু বছর যাতায়াত নাই বক্সা পাহাড়ে। জয়ন্তী বাদ দিলে ২৮ মাইল ২৯ মাইল সর্বত্র হোমস্টে। বক্সা পাহাড় থেকে লেপচাখা, চুনাভাটি, কাতলুং সর্বত্র হোমস্টের ছড়াছড়ি।

নয়ের দশকের মাঝামাঝি। বেড়ানোর এতসব সৌন্দর্যখনি তখনও আবিষ্কার হয় নাই। হঠাৎ একদিন হেল্প টুরিজমের শ্রীমান রাজ বলে, 'গৌরীদা বউদিকে নিয়ে ঘুরে এসো তিনচুলে থেকে'।

পাহাড়ের হোমস্টে নিয়ে দু-চার কথা বলি যা একান্তভাবে আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, ভাল লাগার অনুভূতি। আমি ঠাট্টা করে বললাম— সেটা আমার কোন চুলোতে?

—বেশি দূরে নয়। তাগদা, তিস্তাবাজারের কাছে। মদন প্রধানের বড়া মাঙ্গোয়াও দেখে আসবে।

বেরিয়ে পড়তে যেটুকু সময়। গোছগাছ তো থাকেই। মহিলাদের একটু সময় লাগে বেশি। দাম্পত্য জীবনের অভিজ্ঞতা তাই বলে। আগে থেকে হুঁশিয়ার করে। —চলো চলো। তাড়াহুড়ো করবে না। যাই হোক দু'জনে বেরিয়ে পড়ি যথাসময়ে। সেবক বাজারে একটু নাস্তা সেরে নিই। গরম গরম ভেজ মোমো একটু ঝালঝাল চাটনি সহযোগে। গিন্নি খেল টোস্ট। সবশেষে চায়ে চুমুক। ড্রাইভার কে ছিল মনে নেই। সেও খেল আমাদের সঙ্গে। বেলা এগারোটায় পৌঁছে গেলাম গুরুং পরিবারে।

—'নমস্তে নমস্তে'। আজকের কথা নয়। যৌথ পরিবার, বিশাল বাহিনী। সাদরে গ্রহণ করল প্যাশান ফ্রুটের সরবৎ দিয়ে। তারপর যা হয় কাকিমা, জ্যেঠিমা, মাসিমা, ছেলেমেয়েদের ছুটোছুটি। গিন্নি সটান রান্নাঘরে। ঠাকুমা বটিতে শাক কাটছে। রান্নাবান্নার প্রস্তুতিপর্ব। আমি একটু উঁকিঝুঁকি দিয়ে ওদের ড্রয়িংরুমে বসি। শতবর্ষ প্রাচীন পিয়ানো যত্ন করে রাখা আছে। গুরুং পরিবারের আতিথেয়তায় আমরা দু'জন সত্যি অভিভূত। পরিবারের বয়স্ক বা প্রবীণ কাকা বা জেঠা যারা আছেন আমাদের নিয়ে ঘোরাঘুরি করেন নজরমিনারে নিয়ে যায়। ভাল লাগে ডাইনিং রুমে কাকিমা, জেঠিমা, ছেলেমেয়েদের উপস্থিতি। সে যে কী ভালবাসা জীবনের পরম সম্পদ। তিনচুলে বলা যায় পাহাড়ের প্রথম হোমস্টের সূচনা। ভুল হলে শুধরে দেবেন। তিনচুলের কাছেই তাগদা। যৌবনে তাগদার ছোট্ট বনবাংলোতে রাত কাটানোর স্মৃতি ভোলার নয়। তাগদা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা। অর্কিড সেন্টার বহু পুরাতন। বহুবার আসা যাওয়া। রংলি-রংলয়িট গেল ডিভিশন, তিস্তা ভ্যালি। বড় মাঙ্গোয়াতে শুধু যাওয়া।

রাত্রি যাপন হয় নাই।

তিনচুলে এখন টুরিস্ট ডেস্টিনেশন। তাগদা জুড়ে অসংখ্য হোমস্টের ছড়াছড়ি। যাদের অপছন্দ তারা বিলাসবহুল লজ, রিসর্টে, থাকতে পারেন। হোমস্টে নিয়ে প্রতিদিন আলোচনা, সেমিনার, সরকারি সাহায্য প্রচার অনেক কিছু হচ্ছে, কিন্তু অপ্রিয় কথা হল অনেক হোমস্টের মালিক কোনও গাইড লাইন মানছেন না। যাই হোক আমি এ বিষয়ে নাক গলাতে চাই না। তিনচুলে থেকে একবার সস্ত্রীক বেড়াতে যাই পেশকের পূর্ত বাংলোতে। যৌবনে বন্ধুরা মিলে তিস্তাবাজার থেকে হাঁটিহাঁটি পা পা করে পৌঁছেছিলাম পেশকে। দুর্ভাগ্য সেই অনবদ্য বাংলোটি ভস্মীভূত। মনে পড়ল একবার পূর্ত দপ্তরের বড়বাবু দেবনাথ থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করে বলেছিল, 'যান গৌরীদা বৌদিকে নিয়ে বেড়িয়ে আসুন আমাদের পেশক বাংলো থেকে। একটাই অসুবিধা তখন ছিল, তা হল বিদুৎবিচ্ছিন্ন। কেন কী কারণে জানা নেই। পেশক যেতে হলে দু'দণ্ড বসার জায়গা বা ভিউ পয়েন্ট যাই বলুন, আমরা দু'জন চুপচাপ বসে থাকতাম। নাম লাভার্স মিট। পঞ্চাশ বছর আগে লাভার্স মিট ছিল নিঝুম। কোনও প্রেমিক প্রেমিকাদের দেখি নাই। আমরা তখন চ্যাংরা। অনেক নিচে তিস্তা ও রংগিত গলাগলি করে চলেছে। লেপচা জনজাতিদের একটি উৎসব শীতে হয়। তখন সবাই অংশগ্রহণ করেন। পেশক আমাদের ভীষণ ভাললাগার জায়গা।

পেশক থেকে একবার দু'জনে গেছিলাম গ্লেনবার্ন চা-বাগানে। যাবার পথে লপচুতে একটু বিরতি। লপচুর চা সত্যি সুরভিত। রোদালো ছাদে বসে মোমো, চা-পান। লপচু থেকে যেতে যেতে পথ হারানো গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন কুয়াশায় মাখামাখি ধুপীবনে। এক রাখাল বালক চুপচাপ বসেছিল। ড্রাইভার ওকে গাড়িতে তুলে নিল। ডানদিক-বাঁ দিক করে তাগদা চা-বাগানের পাশ দিয়ে পৌঁছে গেলাম গ্লেনবার্ন। ধুপীবন এখন বিখ্যাত লামাহাটা। গ্লেনবার্ন অভিজাত চা পর্যটনের বাংলো। ইংরেজ জমানার স্মৃতি চিহ্ন বজায় রেখে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। আবার আধুনিক কেতাদুরস্ত বাংলো রয়েছে পাশাপাশি। যার যেমন পছন্দ।

খানদানি বাংলোর প্রাচীন হেরিটেজ সম্ভারে পরিপূর্ণ আসবাবপত্র, পুঁথি-পুস্তক। সাদাকালো দার্জিলিঙের পুরনো ছবি। এর মাধুর্য, আবেদন সম্পূর্ণই আলাদ। খরচাপাতি বিস্তর। সাধারণত পাউন্ড, ডলারধারীদের জন্যই। সাহেব-মেমদের ভিড় বেশি। আর কালো টাকা যাদের আছে, টাকায় ছাতা পড়ে যাচ্ছে, খরচা না করে উপায় নাই তাদের জন্য। আমাদের বেড়ানো বন্ধুত্ব সৌজন্যমূলক। ইংরেজিতে যাকে বলে কমপ্লিমেন্টারি। গ্লেনবার্নের পেছনে রংগিত নদী। ওপারে জোরথাং সিকিম। গ্লেনবার্ন থেকে কাছেই দার্জিলিং।

চা-বাংলোর গল্প অভিজ্ঞতা কম নয় ডুয়ার্সে। হাতিপোতার পাশে ফাসখাওয়াতে থাকা মুকুলদার সৌজন্যে টোটোপাড়ার কাছে লঙ্কাপাড়া, টাটা কোম্পানির সৌজনে ডামডিম, মেটেলি ছাড়িয়ে জুরন্তি, গরুবাথানের মিশন হিলের পাশে ফাগু, তিনধারিয়ার কাছে সেলিম হিল। সবকিছু ছাপিয়ে ওঠে রাজা বাঁড়ুজ্জেদের মকাইবাড়ি। দুর্ভাগ্য হেরিটেজ বাংলোটি পুরাতন স্মৃতিসম্ভার সব কিছু একদিন পুড়ে ছাই হয়ে গেল। পাততাড়ি গুটিয়ে রাজাবাবু এখন

আছেন শিলিগুড়িতে রিমপোচে হাউসে। বলেন দুঃখ করে কী হবে। যা গেছে গেছেই। বেড়ানোর গল্প শেষ হবার নয়।

দু'জনে আবার বেরিয়ে পড়া। গন্তব্য ভূতবাংলো। শুনে গিন্নি বলে— 'তোমার শুধু উদ্ভট পরিকল্পনা'। নাম মরগান হাউস। সত্যি বলছি কালিম্পং শহর ছাড়িয়ে দুরবিনডারার কোলে, ফৌজি গলফ মাঠ। গৌরীপুর হাউসের কাছে ঝিমঝিম কিংপিংঝিং রোডে নিশ্চুপ শুনশান নিঝুম পরিবেশে প্রায় শতবর্ষ প্রাচীন মরগান হাউসে থাকার চার্ম সত্যি আমাদের দু'জনের জিন্দেগি তক ইয়াদ রহেগা।

মরগান হাউস থেকে একদিন ডেলো বেড়িয়ে চলে যাই নির্জনতার খাসতালুক কে কে হোমস্টে। অনবদ্য লোকেশন। ফার ফ্রম ম্যাডিং ক্রাউড। আমাদের ভীষণ ভাল লেগেছিল। খরচাপাতি সামান্য। মাত্র বারশ টাকা মাথাপিছু। থাকা এবং খাওয়া নিয়ে। ভোর থেকে রাত্রি।

কালিম্পঙের গল্প থাক। সিটং-এর গল্প শোনাই। সিটং বিখ্যাত হয়ে ওঠে কমলালেবুর সময়। আমরা গিয়েছিলাম গ্রীষ্মে। ব্যবস্থাপনা হামরো হোমের শ্রীমান পার্থর নেচার বিয়ন্ডের কর্মকাণ্ড বলা যায়। আগেই বলেছি পাহাড় জুড়ে হোমস্টের ছড়াছড়ি, রমরমা। এর কুফল-সুফল দুই পাচ্ছি। যেমন সিলারি গাঁও, পেডং, জুলুক সর্বত্র ঘিঞ্জি এবং অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠছে। চেঁচামেচি, হুল্লোড়। বলাবাহুল্য বঙ্গজনেরা। যাই হোক ক্ষতবিক্ষত কালীঝোরা, লাটপাঞ্চার যেতে নব্যপথ বিরিক হয়ে যায়। চমৎকার মসৃণ সবুজ সুন্দর দারুণ। আহালদারাতে পৌঁছে দেখি খোলা মাঠ। পাশাপাশি চারটে ক্ষুদে কটেজ। একটু নিচে রান্নাঘর কিন্তু কারুর সাড়াশব্দ নাই। কোনও পর্যটকের টিকি খুঁজে পেলাম না। আহালদারার প্রশংসা অনেক শুনেছি, যে কারণে আহালদারার নাম শুনে নেচে উঠেছিলাম। শুধু সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে থাকলে পেট ভরবে, না মন ভরবে? গিন্নি খেপচুরিয়াস। তুমি থাকো এখানে বসে মালা জপ করো। যত্তসব। আহা অ্যাতো ধৈর্যহারা হলে চলে? শ্রীমান পার্থকে ফোন করে পেয়ে যাই। —হ্যাঁরে বাবা কোথায় পাঠালি আমাদের। তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে রাক্ষসপুরী। লোক নেই, জন নেই। শুধু তোর কাকিমা আর আমি? মাথার বাকি চুলগুলো টেনে ছিঁড়বে তোর কাকিমা। কানমোলা খা।

—স্যার টেনশন নেবেন না। আপনারা চলে আসুন ঘালেটারে। চালককে বলি চলো অমূল্যভূষণ ঘালেটার। ঘালেটারে পৌঁছে খুশি, নিশ্চিন্ত। গড়িয়ার এক যুবক সদ্য এসেছে মা-বাবাকে ছেড়ে নির্জন পাহাড়ে। বলে— কাকু, এই ঘরটা আপনাদের জন্য। ভাল ভিউ পাবেন।

—ঠিক আছে। এখন একটু চা-টার ব্যবস্থা করো তারপর দুপুরে খানাখাজানা। গিন্নি বলে— লোকজন না থাকলে আমার মোটেও ভাল লাগে না। ঘালেটার নিঃসন্দেহে ভাল। আমাদের দু'জনের দৌড়ঝাঁপে অনীহা। বারান্দায় চেয়ারে বসে প্রকৃতিবীক্ষণ এবং একটু পায়চারি, যা বয়সের ধর্ম। বেশি কোলাহল কলরব এখন ভাল লাগে না।

ঘালেটারের কাছেই নামথিং পোখরি সালামান্ডারদের প্রিয় জায়গা। সুখা সময় বলে ওরা একটু আড়ালে। একদিন ঘালেটার থেকে মেঘ-কুয়াশায় ভাসতে ভাসতে বেড়াতে যাই মহলদীরাম। জলদাপাড়ার বিশুর কর্মকাণ্ড দেখার উদ্দেশ্যে। সত্যি এক আজবপুরী। বাপি বলে— 'স্যার আপনাদের লাগেজপত্র কোথায়? থাকবেন তো? বিশুদা তো তাই বলল।

—নারে বাপু। দেখতে আসা। গরম কাপড়চোপর সঙ্গে নাই। ভীষণ কনকনে ঠান্ডা এখানে।

—একটা রাত থাকুন।

—পরে এসে একবার থাকব।

চা-টা খেয়ে একটু ঘুরে ফিরে দেখি ভগবানের দেশ মহলদীরাম। জাংপানা চা-বাগানের ডিভিশন। বাগোরা, দিলারাম হয়েও আসতে পারেন। সত্যিই গডস ওন কান্ট্রি। গিন্নি বলে কবে আমরা এখানে আসব?

—ঠাকুর যেদিন টানবে। আমি তো ধোপার গাধা। চলো যাই। দুপুর দুটো বাজে।

(চলবে)

রাজনগরের রাজনীতি

(২)

প্রজাতন্ত্রের সূচনাতেই আঘাত হানল খাদ্য সংকট

বন্যা বা বঙ্গাল খেদাও বাড়িয়েই চলল উদ্বাস্তুর ভিড়

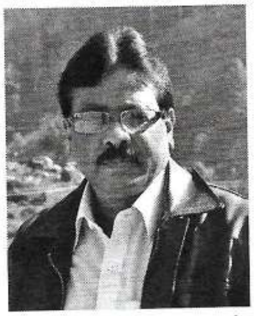

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

রাজনীতির সাপলুডো খেলায় সাবেক রাজন্য শাসিত রাজ্য কোচবিহার তার অতীত গরিমা হারিয়ে শুধু মাত্র পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলাতে পরিণত হয়ে গেল। সাজানো গোছানো সুন্দর একটি শহর ও সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ও সামাজিক পরিকাঠামো যুক্ত একটি দেশীয় রাজ্য এক লহমায় রাজ্য থেকে জেলা বনে গেল। সময়ের নিরিখে এটি উত্তরণ না অবতরণ তার জবাব আজও মেলে নি। তবে ইতিহাসের নিরিখে ঘটে যাওয়া বাস্তবটা অত্যন্ত রূঢ়। রাজন্য শাসিত করদ মিত্র রাজ্য কোচবিহার যদি র‍্যাডক্লিফ (Radcliffe) বাটোয়ারাতে তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানে চলে যেত, তবে ওই দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মত করুণ পরিণতি হত সাবেক কোচবিহারবাসীরও— এটা যেমন নির্জলা সত্যি, তেমনি দেশ বিভাগের ফলে সাবেক পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীর ঢল ত্রিপুরা অসমের মত বাংলার এই উত্তর প্রান্তীয় জেলার জনবিন্যাসকে যে আমূল পাল্টে দিয়েছে একথাও বাস্তব সত্য।

যাইহোক, রাজ আমলে কোচবিহারের প্রজাবৎসল মহারাজারা যে নিজ প্রজাদের সন্তানের মত করে আগলে রাখতেন এ কথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। ১৯৪৩ এর মন্বন্তরের সময় গোটা বাংলা জুড়ে অসংখ্য মানুষ যখন অনাহারে মারা গেছেন, কোচবিহারের মানুষের গায়ে কিন্তু তখন কাঁটার আঁচরটিও লাগে নি। দুর্ভিক্ষের আঁচ পেয়ে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর আগেভাগে কোচবিহারে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী মজুত করে রেখেছিলেন। তাই ওই দুর্ভিক্ষে না খেতে পেয়ে কোচবিহারে অন্তত কেউ মারা যান নি।

সাতচল্লিশে ভারত স্বাধীন হলেও কোচবিহারে রাজ থেকে স্বরাজ এসেছে পঞ্চাশ সালে। স্বাধীন সার্বভৌম ভারতে অন্তর্ভুক্তির পর পশ্চিমবঙ্গের একটিজেলা হিসেবে পরিগণিত হতেই চিত্রটা বেমালুম পাল্টে গেছে। তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়। কোচবিহার বরাবরই খাদ্যে স্বয়ম্ভর এলাকা ছিল। কিন্তু দেশ বিভাগের ফলশ্রুতিতে অসংখ্য উদ্বাস্তু আগমন এবং এ দেশে থেকে অনেক মুসলমান কৃষিজীবি পরিবার পাকিস্তানে চলে যাওয়াতে সে বছর কিছুটা খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে দেওয়া ভুল তথ্য অনুযায়ী সে বছরও কোচবিহারকে উদ্বৃত্ত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে এখান থেকে প্রচুর খাদ্যসামগ্রী বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। জন্মের শুরুতেই মাতৃদুগ্ধ বঞ্চিত শিশুর মত গোটা জেলা জুড়ে তখন দেখা দিল প্রচণ্ড খাদ্যাভাব। চালের দাম দাম প্রতি মন ১৮ টাকা থেকে বেড়ে প্রায় ৪৫-৫০ টাকায় পৌছে গেল। পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন ও খাদ্যের দাবিতে দল মত নির্বিশেষে শুরু হল তীব্র গণ আন্দোলন। আবেদন নিবেদনে কোনও কাজ হল না। চালের দাম হু হু করে বেড়ে চলল। বিশেষ করে সদ্য বাস্তুচ্যুত মানুষদের ভাঁড়ারে টান পড়ল সব চেয়ে বেশি। হিন্দু মহাসভা, সোশালিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ডব্লক, কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারা মিলে যৌথ সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুললেন। শুরু হল প্রতিবাদ প্রতিরোধ বিক্ষোভ। তবু সরকার উদাসীন। ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস। সর্বদলীয় প্রতিনিধিদের সাথে প্রশাসনের আলাপ আলোচনা ব্যর্থ হল। ১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হল ভুখা মিছিল। ২০ এপ্রিল আবার মিছিল। সেই মিছিলে জন জোয়ার। ভীত সন্ত্রস্থ প্রশাসন গণ বিক্ষোভ ঠেকাতে সাগর দিঘীর চার পারে জারি করল ১৪৪ ধারা। কিন্তু আন্দোলনকারীরা সে কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে নি। পর দিন ২১ এপ্রিল আবার শুরু হল ভুখা মিছিল। সে দিন ছিল শনিবার। ভবানীগঞ্জ বাজারের দিক থেকে মিছিল এগিয়ে চলল সাগরদিঘীর দিকে। একটু একটু করে অগুন্তি মানুষের স্বতস্ফূর্ত বিক্ষোভে দীর্ঘায়িত হয়ে উঠল সেই মিছিল। সাগরদিঘীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসের সামনে পুলিশ ব্যারিকেড ভেঙে মিছিল এগিয়ে যেতেই শুরু হল পুলিশের বেপরোয়া লাঠি চার্জ। জনতা ছত্রভঙ্গ। বেঁধে গেল ধুন্ধুমার কাণ্ড। শুরু হল পেছন থেকে উত্তেজিত জনতার ইট বৃষ্টি। ইটের ঘায়ে বেশ কয়েকজন পুলিশ আহত হল। এবার আর দেরি নয়, আদেশ এল 'ফায়ার'। শুরু হল নির্বিচারে গুলি বর্ষণ। মুহূর্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সাত বছরের ছোট্ট শিশু বকুল তালুকদার আর তের বছরের কিশোরী কবিতা বসু। পরে সদর হাসপাতালে মারা গেলেন তের বছরের বাদল বিশ্বাস, ষোড়শী বন্দনা তালুকদার আর পঁচিশ বছরের তরতাজা যুবক সতীশ দেবনাথ। আহত হলেন আরো অনেকে। পঞ্চ শহীদের বুকের রক্তে লাল হয়ে উঠল কোচবিহারের মাটি। স্বাধীন সার্বভৌম ভারতে সংযুক্তির পর গণ আন্দোলনের প্রথম শহীদ হিসেবে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইলেন কোচবিহারের পাঁচ বীর সন্তান বকুল বন্দনা কবিতা বাদল সতীশ।

কোচবিহারে পুলিশের গুলি চালনার ঘটনার প্রতিবাদে গোটা রাজ্য জুড়ে ঝড় উঠল। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি বসু, ননী ভট্টাচার্যের মত রাজ্যের প্রথম সারির ডান বাম নেতারা ওই ঘটনার প্রতিবাদে ছুটে আসেন কোচবিহারে। পরবর্তীকালে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুজনিত কারণে হিন্দু মহাসভার প্রভাব এই রাজ্যে বেশ কিছুটা কমে গেলেও কংগ্রেস বিরোধী শক্তি হিসেবে বামপন্থী আন্দোলনের ভিত্তিটা অতি অবশ্যই তৈরি হয়েছিল ১৯৫১ সালের খাদ্য আন্দোলনে কোচবিহারে পুলিশের গুলিচালনার ঘটনার পর। যদিও সার্বিক বাম ঐক্য সংগঠিত না হওয়ায় ১৯৫১-র খাদ্য আন্দোলনকে পুঁজি করে পরবর্তি কয়েকটি নির্বাচনে বামেরা এ জেলায় খুব একটা সফল হয়ে উঠতে পারে নি। পাশাপাশি রাজনীতি সচেতন স্থানীয় জোতদার ও ধনী ভূস্বামীদের মধ্যে কংগ্রেসের একটা বড় প্রভাব ছিল। নির্বাচন সংগঠন ও নিয়ন্ত্রনে অর্থ বলে বলীয়ান গ্রামীণ ধনিক শ্রেণির প্রভাবকে কংগ্রেস সে সময় পুরোপুরি কাজে লাগাত। কোচবিহারের সহজ সরল স্থানীয় মানুষজন নিজেদের অধিকার সম্পর্কে খুব একটা সচেতন ছিলেন না। ১৯৫২ এবং পরবর্তি নির্বাচনে কংগ্রেস অনায়াসে জিতে গেল। কংগ্রেসের বিধায়ক সতীশ সিংহ রায় বিধান রায়ের মন্ত্রীসভায় স্থান পেলেন।

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক। গুলিচালনার মত অমানবিক বিপর্যয়ের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ১৯৫৪ সালের বর্ষায় গোটা জেলা জুড়ে শুরু হল আর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়, প্রলয়ঙ্করী বন্যা। শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। তোর্ষায় বান ডাকল। ফুলে ফেঁপে উঠল নদী। শুধু জল আর জল। কুল ছাপিয়ে সেই জল ডুবিয়ে দিল রাজনগর কোচবিহারকে। বাইরে জল ঘরে জল, চারিদিকে জল থৈ থৈ। একের পর এক বাড়ি ঘর মাঠ ঘাট জনবসতি বিলীন হয়ে গেল তোর্ষার গ্রাসে। হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে আশ্রয় নিলেন শিবিরে। শুরু হল ভাঙন। নদী গর্ভে তলিয়ে গেল মন্দির মসজিদ একে একে। নদী ভাঙতে ভাঙতে পাটাকুরায় রাজাদের সমাধি ক্ষেত্র কেশবাশ্রম (রানী বাগান) ও রাজপ্রসাদের কাছাকাছি পৌছে গেল। উদ্বিগ্ন মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ১০০ শব্দের একটি টেলিগ্রাম পাঠালেন বন্ধুবর প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে। টেলিগ্রাম পেয়েই পণ্ডিত নেহরু সোজা চলে এলেন কোচবিহারে। বিপন্ন কোচবিহারবাসী ওই সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তেও ফুলে ফুলে বরণ করে নিয়েছিলেন

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীকে। কোচবিহার বিমান বন্দর থেকে হুড খোলা জিপে চড়ে পণ্ডিত নেহরু সোজা পৌঁছে গেলেন বন্যা বিধ্বস্ত তোর্ষার তীরে। সঙ্গে সরকারি আধিকারিকরা ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। হাজার হাজার মানুষ তাদের দাবি জানাতে ঘিরে ধরলেন প্রধানমন্ত্রীকে। ভিড়ের মধ্যে থেকে হাফপ্যান্ট পরিহিত বেঁটে বামন পরিমলদা চিৎকার করে ইংরাজিতে বলে উঠলেন, "স্যার, ইরিগেশন অফিসার ডুয়িং নথিং, ওনলি ব্রাইবিং এণ্ড গ্যামব্লিং"। পণ্ডিত নেহরু হাত নেড়ে বললেন, "ইয়েস, ইয়েস, আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড"। ওই দুঃখের মুহূর্তেও পরিমলদাকে সমবেত জনতা কোলে তুলে হৈ হৈ করে নেচে উঠেছিল। কোচবিহার ছেড়ে যাবার আগে, গোটা শহরকে তোর্ষার করাল গ্রাস থেকে বাঁচাতে নেহরুজি হরিণ চওড়া থেকে খাগড়াবাড়ি পর্যন্ত সাত কিলোমিটার দীর্ঘ বাঁধ নির্মানের কথা ঘোষণা করে গেলেন। নড়ে চড়ে বসল রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তর। হরিদাস লাহিড়ী, কামক্ষ্যা রায় চৌধুরীদের মত প্রথম শ্রেণির কনট্র্যাক্টরদের দিয়ে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে বাঁধ নির্মাণ শুরু হয়ে গেল। অজস্র শালবল্লার পাইলিং, লোহার জাল আর বড় বড় বোল্ডার দিয়ে বছর তিনেকের মধ্যে শক্ত পোক্ত বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন হল। রক্ষা পেল কোচবিহার শহর, রক্ষা পেল পাটাকুরা, কেশবাশ্রম আর রাজপ্রসাদ। তবে গোটা শহরের মানচিত্র গেল পাল্টে। রাজনগরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের প্রায় দু' কিলোমিটার এলাকা লয় হয়ে গেল নদী গর্ভে। এদিকে নদী ভাঙনে নতুন করে উদ্বাস্তু হল অসংখ্য পরিবার। রাজতন্ত্র বিলীন হলেও রাজভক্ত প্রজারা কিন্তু পুনর্বাসনের আবেদন নিয়ে আবার মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণের শরণাপন্ন হলেন। প্রজাবৎসল মহারাজা শহরের পূর্ব প্রান্তে পিলখানার কাছে তাঁর নিজস্ব জমিতে পুনর্বাসন দিলেন বাস্তুচ্যুত প্রজাদের। পত্তন হল নতুন বসতি নিউ পাটাকুরা। নস্টালজিক বৃন্তচ্যুত মানুষজন সেখানেও গড়ে তুললেন ছেড়ে আসা একটি গোলবাগান।

বন্যার গ্লানি ভুলে কোচবিহারের মানুষ সবে একটু মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করেছে। ঈশান কোণে আবার দেখা দিল সিঁদুরে মেঘ। পার্শ্ববর্তী রাজ্য অসমে শুরু হল 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন। উগ্র প্রাদেশিকতার জঙ্গি আন্দোলনে হাজার হাজার হিন্দু বাঙালি পরিবার ভিটে মাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে অসম সংলগ্ন কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের গ্রামে গঞ্জে আশ্রয় নিতে শুরু করলেন। কোচবিহারের সংবেদনশীল মানুষজন প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। কেন্দ্রে এবং অসমে তদানীন্তন ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ঝড় উঠল। প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেতে কন্যা ইন্দিরা গান্ধীকে অসমে পাঠালেন। ইন্দিরা তখন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি। অসম যাতায়াতের পথে তিনি কোচবিহার বিমান বন্দরে নামবেন— এই খবর রাষ্ট্র হতেই বামপন্থী দলগুলির পক্ষ থেকে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী মিছিল করে পৌঁছে গেলেন বিমান বন্দরে। দলের নেতারা সঙ্গে নিয়ে গেলেন কালো কাপড়। ঠিক হল ইন্দিরা বিমান থেকে নামলেই তাঁকে কালো কাপড় পরানো হবে। ইন্দিরার বিমান কোচবিহার বিমানবন্দরে অবতরণ করল। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন প্রিয়দর্শিনী। কালো পতাকা আর কালো কাপড় নিয়ে

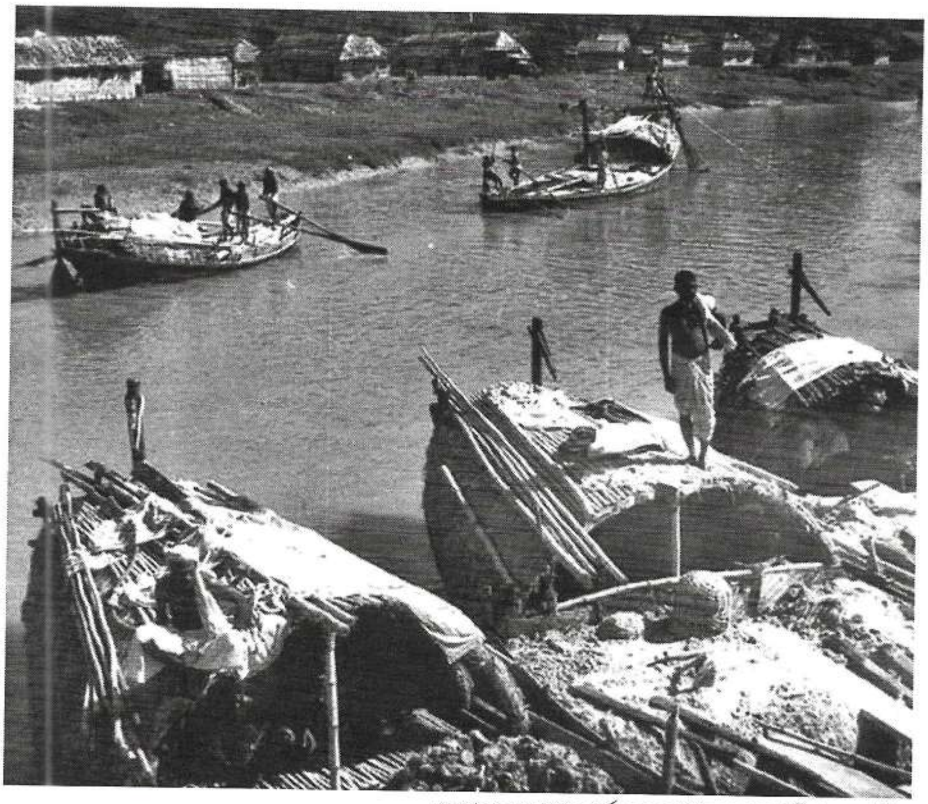

একশ বছর আগে তোর্সার জলপথে চলত কোচবিহারের বাণিজ্য

বন্যার গ্লানি ভুলে কোচবিহারের মানুষ সবে একটু মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করেছে। ঈশান কোণে আবার দেখা দিল সিঁদুরে মেঘ। পার্শ্ববর্তী রাজ্য অসমে শুরু হল 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন। উগ্র প্রাদেশিকতার জঙ্গি আন্দোলনে হাজার হাজার হিন্দু বাঙালি পরিবার ভিটে মাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে অসম সংলগ্ন কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের গ্রামে গঞ্জে আশ্রয় নিতে শুরু করলেন। কোচবিহারের সংবেদনশীল মানুষজন প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। কেন্দ্রে এবং অসমে তদানীন্তন ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ঝড় উঠল। প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেতে কন্যা ইন্দিরা গান্ধীকে অসমে পাঠালেন। ইন্দিরা তখন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি। অসম যাতায়াতের পথে তিনি কোচবিহার বিমান বন্দরে নামবেন— এই খবর রাষ্ট্র হতেই বামপন্থী দলগুলির পক্ষ থেকে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী মিছিল করে পৌঁছে গেলেন বিমান বন্দরে।

মারমুখী বিক্ষোভকারিরা ঘিরে ধরলেন ইন্দিরাকে। কংগ্রেস নেতা সন্তোষ (কালী) রায় আর (বিশু) নিয়োগী কংগ্রেস সেবা দলের স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে ইন্দিরাকে আগলে রাখলেন। শুরু হল ধস্তাধস্তি মারপিট ইঁট বৃষ্টি। প্রচণ্ড মার খেয়ে আহত হলেন সন্তোষ (কালী) রায় আর সুধীর (বিশু) নিয়োগী। শেষ পর্যন্ত পুলিশ আর সেবাদলের স্বেচ্ছাসেবকরা কোনও মতে ইন্দিরাকে আবার বিমানে তুলে দিলেন। বিমান রানওয়ে ছুঁয়ে উড়ে গেল আকাশে। তবে ইন্দিরা চলে যেতেই আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান শুরু হল। বামপন্থীরা নতুন করে অক্সিজেন পেল ওই ঘটনায়।

এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই রাজনগরে ঘটে গেল আর এক মর্মান্তিক ঘটনা। সেটা ১৯৬১ সাল। আমরা তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। সেবার সারা বছর ধরে স্কুলের শত বার্ষিকী অনুষ্ঠান চলছে। এরই মধ্যে আমাদের অ্যানুয়াল পরীক্ষাও এসে গেছে। বার্ষিক পরীক্ষা আর রাসমেলা তখন আসত হাত ধরাধরি করে। তাই শেষের দু-তিনদিনের বেশি মেলা দেখার সৌভাগ্য হত না আমাদের। তখন সার্কাসই ছিল মেলার মূল আকর্ষণ। আমরাও সার্কাসের জন্য মুখিয়ে থাকতাম। সেবার রাসমেলায় এসেছে অমর সার্কাস। তাঁবু পড়েছে জেনকিন্স স্কুলের দক্ষিণ আর মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ স্কুলের পশ্চিম দিকের মাঠে। সার্কাস দেখার জন্য আমাদের মন উড়ু উড়ু। সার্কাসের পশুপাখি আর কুশীলবদের দেখতে টিফিন পিরিয়ডে সার্কাসের তাঁবুর সামনে সবাই ভিড় জমাতাম। এরই মধ্যে একদিন সার্কাসের জিপ শহরে বেরিয়েছে 'ট্রায়াল রানে'। ফেরার পথে ভিড়ের মধ্যে তাল সামলাতে না পেরে ওই জিপটি চাপা দেয় ক্লাস নাইনের এক ছাত্রকে। প্রায় সাথে সাথেই ছাত্রটির মৃত্যু হল।

(ক্রমশ)

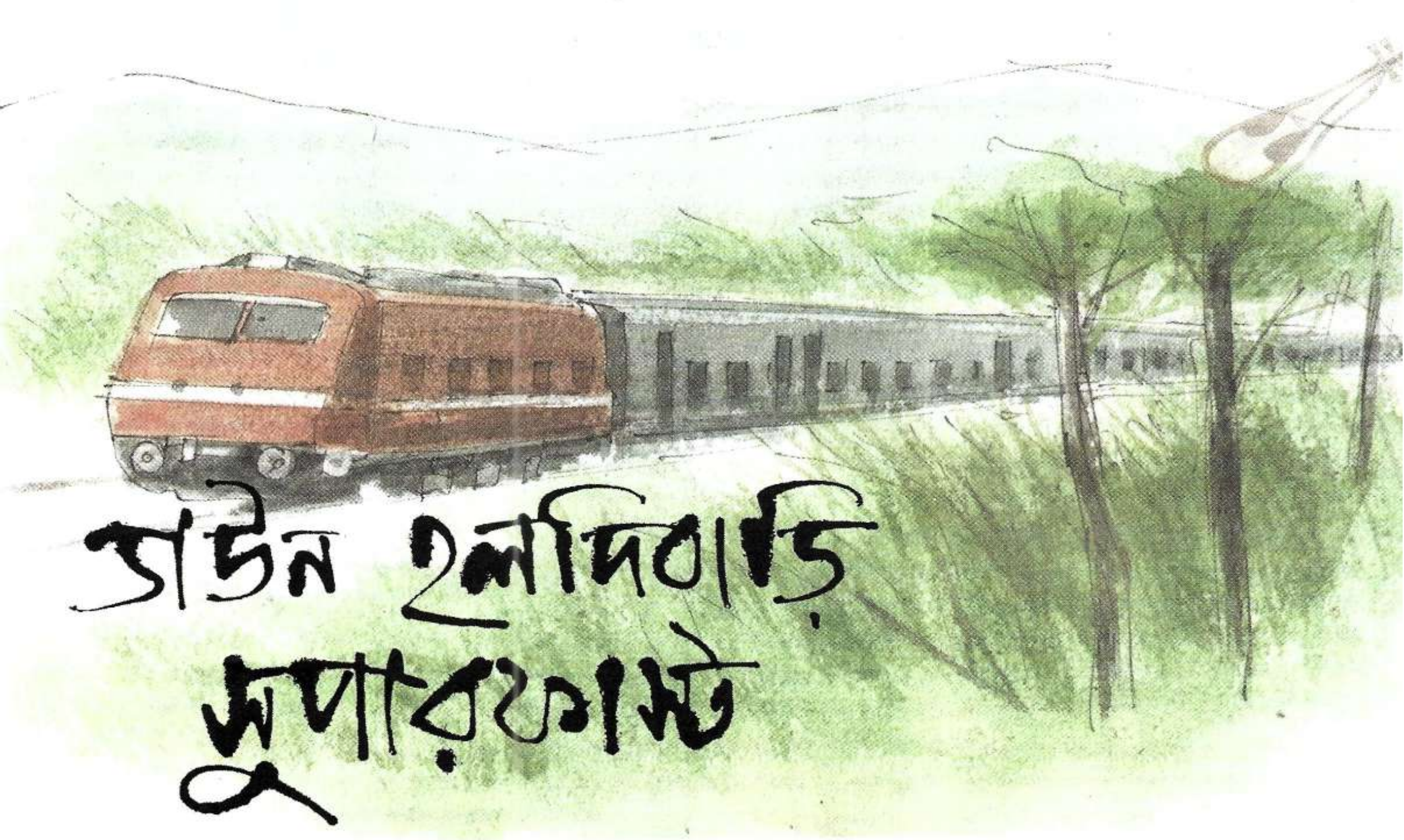

ডাউন হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট

সুজিত দাস

যেন জীবনের ট্রেন থেকে একে একে নামছে চরিত্রগুলি। ওয়েবলি স্কট থেকে ছিটকে যাওয়া বুলেটের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা সৌরভ। পোস্ত গাছের মায়াময় আঁঠায় জড়িয়ে থাকা রামা ঘোষ। উল্টো দিকের প্ল্যাটফর্মে ধূপের গন্ধ চুলে মেখে নেয় ইলা ব্যানার্জি। তাঁর ঘরে থর থর করে কবিতা, লিটল ম্যাগাজিন। টুং টাং রবে বেজে যায় সংস্কৃতি। একদা বিপ্লব করা সম্পাদক তথাগতর আগুন এখন কেবল ফেসবুকে। মধুপুরে ইলা ব্যানার্জির 'মধুকুঞ্জ'। ইলা ব্যানার্জি ফোন করলেন অপাপবিদ্ধা সিংহ রায়কে। কিন্তু কেন সৌরভ? কেন ইলা? কেন তথাগত? কেন রোহন? বুলেট আর কবিতার যুগলবন্দী কেন হাত ধরাধরি করে নেমে আসছে উপন্যাসের প্ল্যাটফর্মে? পড়ুন এক অভিনব উপন্যাসের দ্বিতীয় কিস্তি। সিগন্যাল লাল থেকে সবুজ হয়ে ধারণ করছে অন্য কোনও রঙ। ট্রেন চলছে।

৩।

'তোর থেকে তিনটা পেচ্ছাপের পয়সা পাই এখনও',

ব্ল্যাক ডগের পাঁচ নম্বর পেগটা শেষ করে চিকা বিশুর মনে পড়ে পুরনো ধারবাকির কথা। এন জে পি স্টেশন থেকে একটু দূরের এই পানশালায় চিকা বিশু আর বাটা সুভাষ। বাটা সুভাষ একটু আড়াল পছন্দ করে। পানশালার এমন একটা কর্নারে বসে যাতে ওকে কেউ দেখতে না পায়। বাটা সুভাষ মদের গ্লাস নিয়ে বসে থাকে ঠিকই কিন্তু খায় না। মদ খেলেই হিসেব উল্টোপাল্টা হয়ে যায়, অঙ্কে ভুল হয়। যেমন হয়েছিল টনা ঘোষের। চার্লস হোটেলের পাশেই নিজের ডেরায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে মাথায় দানা ঢুকিয়ে দেয় নিজের গ্রুপের ছেলেই। কোমর থেকে মেশিন বের করতে পারেনি টনা, চেনা ছেলের হাতে নিজের মৃত্যু দেখেও ঘোড়া টানতে পারেনি মাতাল টনা। এককালের শার্প শুটার। সেই টনা ঘোষের ছেলে বাটা সুভাষকে শিলিগুড়ির এলিট শ্রেণীর মানুষজন অন্যভাবে চেনে। সুভাষ অঙ্কে মাস্টার্স, ভিনটেজ কার র‍্যালির অর্গানাইজার এবং চিকা বিশুর মত অনেক সুতোর একমাত্র লাটাই। অন্ধকার দুনিয়ার টাকা রাজনীতিতে খাটে, সমাজসেবায় খাটে। সুভাষ ঘোষ এই শহরের ম্যান ফ্রাইডে। টাকা, টাকাই। কোত্থেকে এল, সেটা খুব কম মানুষেই জানতে চায়। বেইমানির টাকা ইমানদারির দুনিয়ায় খুব ভাল ফিট করে, জানে সুভাষ। এই মুহূর্তে চিকা বিশু অর্ধেক আউট। সাইকেডেলিক আলো

ভুলে, স্টেজে নেচে যাওয়া মেয়েগুলোকে ভুলে, পাশের চেয়ারে বসে থাকা ফাঁড়ির বড়বাবুকে ভুলে গিয়ে চিকা বিশু আবার তাগাদা দেয়,

'তোর থেকে তিনটে পেচ্ছাপের পয়সা পাই।'

এই জন্য জীবনে কোথাও বাকি রাখতে নেই। শালা কবে বাকিতে মুতেছিল, এখনও নেশা করলেই কথা শোনায় চিকা বিশু। এ বড় আহ্লাদের তাগাদা যদিও।

হিলকার্ট রোডে বাটার দোকানের পাশেই চানাপট্টির গলি। গলির মুখেই সুভাষ ঘোষের বাবা টনা ঘোষের ওষুধের দোকান। দোকানটা টনার বসার জায়গা, ঘোষিত ব্যবসা। তখনও হিলকার্ট রোডের দুদিকে কাঠের দোতলা বাড়ি। তখনও শিলিগুড়ি বাস সিন্ডিকেটের বাস চলত। সেবক রোড বাড়ে নি আড়ে ও বহরে। তখনও পুলিশ ও মাস্তান এক টেবিলে গ্লাস নিয়ে বসত না। পার্টি চিকনা আসিককে টপকায় প্রদীপ দারোগাকে দিয়ে। তারপরই টনার মাথায় হিলকার্ট রোডের তাজ। টনার খবরিলাল ছিল চিকা সুভাষের বাবা ঝন্টু। টনার দৌলতে মিউনিসিপ্যালিটি ইউরিনালের লিজ মালিকানা ঝন্টুর। পেচ্ছাপ-১/-, ল্যাট্রিন ২/- লেখা দরজার সামনে বসে থাকতে থাকতেই একদিন সামনে রাখা খুচরোয় মাথা এলিয়ে পড়ে ঝন্টুর। বিশু তখন তেরো, রোগাপাতলা। ডাকনাম চিকা। বাপের গু-মুতের দোকানে সুন্দর ফিট করে যায় কৈশোর শেষ হওয়ার আগেই।

রাত যত বাড়ে, নেশা তত জাল বিছাতে শুরু করে শরীরে। মেয়েগুলোও নেচে যেতে থাকে। ট্র্যাকে গান বেজে যাচ্ছে, 'মুন্নি বদনাম হুয়ি...।' আধঘন্টা ধরেই লড়াইটা চলছে চিকা বিশুর সঙ্গে কাঞ্চন ডাক্তারের। দুজনের সামনেই কয়েকটা পঞ্চাশের বাণ্ডিল। ফ্লোর বয় এসে টাকা নিয়ে যাচ্ছে দুই টেবিল থেকেই। দিন দুয়েক হল এসেছে নতুন মেয়েটা। হল্টার নেক আর রাগেড জিন্সের এই মেয়েটা পারফেক্ট আগ্রাওয়ালি। গলার নীল শিরা দেখা যায়, জিন্সের ভাঁজে ভাঁজে মোমের মতো উরু। কাঞ্চন ডাক্তার আসল ডাক্তার না। ব্রিজ কোর্স করা ডিগ্রি আছে বটে একটা কিন্তু মোটের ওপর হাতুড়ে, বেয়ার ফুটেড। দুএকটা নার্সিং হোমের রেসিডেন্সিয়াল ডাক্তার। মূল ইনকাম অ্যাবরশন থেকে। কাঁচা পয়সা একটু ঝনঝন করলেই 'বার' মুখি। চিকা আর কাঞ্চনের একই টার্গেট। আগ্রাওয়ালি। মেয়েটিও খেলে যাচ্ছে শরীর দুলিয়ে, চোখের ইশারায়। কাঞ্চন ডাক্তারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টাকা উড়িয়েই যাচ্ছে চিকা। অথচ ডিলটা আজই করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নের অমল এন জে পি দেখে। এন জে পি থেকে শেয়ালদা হকার ইউনিয়নের শেষ কথা অমল। অমল ভাল ছেলে, অমল বারে আসে না। তবু ডিলটা আজই ফাইনাল করতে হবে। ডাউন হলদিবাড়ি সুপারফাস্টের ডাকটা চিকা বিশু নিলে নিশ্চিত হতে পারে সুভাষ। মদ আর মেয়ে বাদ দিলে চিকা বিশুকে চোখ বন্ধ করে ভরসা করা যায়। ফাঁড়ির বড়বাবুকে নিয়ে আসা ওই জন্যই।

সুভাষের সামনে অনেক কাজ। সুভাষ জানে না এখনও, ও ভালর দলে খেলছে না মন্দের দলে। 'কোড গ্রিন' থেকে মেসেজ এসেছে রাঙ্গাপানির অ্যাসিড কারখানা বন্ধ করতে হবে। দুটো রাস্তা খোলা। হয় ট্রেড ইউনিয়নের ঝামেলা পাকিয়ে কারখানা বন্ধ করে দাও নয়ত ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট। পরেরটায় ঝুঁকি বেশি কিন্তু পলিটিকাল লোকের ইনলভমেন্ট নেই। 'ট্রিপল আর' মংরা মাতালের থ্রু মেসেজ পাঠিয়েছেন। এলাকার সব নদী এই অ্যাসিড কারখানার লিকুইড ওয়েস্টে ভরে যাচ্ছে। কারখানাটাকে মাটিতে মেশাতেই হবে।

চিকা বিশু, ফাঁড়ির দারোগা, নাচনেওয়ালি, মদের গ্লাস... এসবের মধ্যেও মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে রাঙ্গাপানির অ্যাসিড কারখানা। এই মুহূর্তে পলিটিক্যালি কে কোথায় আছে, এ এক জটিল জিগশ পাজল। ট্রেড ইউনিয়নকে জড়ালে বহু লোককে কনফিডেন্সে নিতে হবে। এই রিস্ক এখন নেওয়া যাবে না একদম। লোকাল কাউকেও জড়ানো ঠিক হবে না। আজ রাতেই মংরা মাতালকে ট্রেনে বর্ধমান পাঠাতে হবে। কাজটার জন্য ননে ছাড়া কাউকে ভরসা করা যায় না। ফুটপ্রিন্ট থেকে যাবে। নতুন এসডিপিও সৌরভ দত্ত মালটা বেশ খারুশ। পরশু এক ভলান্টারি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে এমপি, এমএলএ-এর সঙ্গে সুভাষও অতিথি হিসেবে মঞ্চে ছিল। সৌরভ দত্তের চাউনি এবং আচরণ খুব শীতল দেখাল। হোমওয়ার্ক ভালই করে ফেলেছে এরমধ্যে। তাতে কিছু যায় আসে না বাটা সুভাষের। মংরাকে দিয়ে ননে-কে খবর পাঠাতে হবে। মেসেঞ্জার, ফোন, ওয়্যাটস্ অ্যাপ কিচ্ছু ইউজ করা যাবে না। ক্লাউড বড় কঠিন জায়গা। ক্লাউডে সব থেকে যায়। বৃহস্পতিবার মধুপুরে ট্রিপল আর-এর জনসমাবেশ। শুক্রবারের 'উত্তরবঙ্গ বার্তা'-র প্রথম পাতায় রাঙ্গাপানির খবরটা ছবিসহ চাই সুভাষের।

'তোর থেকে তিনটা পেচ্ছাপের পয়সা পাই এখনও',

ডিল ফাইনাল। চিকা বিশু এখন ক্লাউড সেভেনে। ফাঁড়ির দারোগাও।

৪।

বিল্বমঙ্গল রায় এবং সুহাসিনী দেবীর কোনও সন্তানাদি ছিল না। বিয়ের পর অনেকদিন তাবিজ কবজ, যজ্ঞ পুজো। ধুমবাবা ঠাকুর থেকে জল্পেশ, সেবক কালীবাড়ি থেকে ভ্রামরি দেবীর মন্দির কোথায় না হত্যে দিয়েছেন সুভাষিণী! বিল্বমঙ্গল কাজের মানুষ। সেই সকালে মালবাজারের প্রাসাদোপম বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান চা-বাগানে। ম্যানেজার থাকলেও এম ডি বাংলোর ওপরের ঘরটা তাঁর প্রিয় জায়গা। আদিগন্ত সবুজ গালিচার মোহেই একটু একটু করে এই বাগান তৈরি করেছেন বিল্বমঙ্গল রায়। এখন বড় কোম্পানির সঙ্গে টাই আপ করা আছে এই বাগান। দৈনন্দিন কাজে মাথা না গলালেও সকালে একবার আসা চাই বিল্বমঙ্গলের। কুলিলাইনের হল্লাগুল্লা, চা-পাতার গন্ধ, চার্চের যীশুকে একবার না দেখলে বিল্বমঙ্গলের ভাল লাগে না। এখনও রয়্যাল এনফিল্ড দাপিয়েই আসেন, যান। কালো বুলেট এখনও এক কিকেই দরাজ গলায় হেসে ওঠে। ফেরার পথে শেড ট্রি-দের সঙ্গে কথা হয়। কথা হয় ধনেশ পাখির সঙ্গে। দলছুট লেপার্ডও নজরে এসেছে বারকয়েক। একবার ভালুকের বাচ্চাও নিয়ে এসেছিলেন বাড়িতে। তখন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের এত কড়াকড়ি ছিল না। সন্ধের দিকে সেই ভালুকের জ্বর আসত। সে এক আজব ব্যাপার। সুহাসিনীর অনুরোধে সে আপদ বিদায় হয় বাড়ি থেকে। বিল্বমঙ্গল রায় দরাজ মানুষ। বনজঙ্গল, বাগ বাগিচা নিয়ে বেশ রসস্থ হয়ে আছেন। বাড়িতে মানুষ বলতে তো সাকুল্যে দুজন। চাকরবাকর, ড্রাইভার, ফুরনের লোকজন নিয়ে পাত পড়ে বিশ বাইশটা। আসলে বিল্বমঙ্গল একা থাকতে পারেন না। মানুষ চাই সঙ্গে, মানুষ। ডুয়ার্সের আর কোনও বাগানের মালিক বাজার করতে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারেন না। বিল্বমঙ্গল পারেন এবং চাকর শিবুকে নিয়ে প্রায় রোজই বাজার যেতে হয় ওঁকে। বাজার দেখলেই মন ভাল হয়ে যায়। সবুজ রাইসরিষার শাক, ডগায় দুটো হলুদ ফুলের আভাস কিংবা বথুয়া শাকের পাতায় লেগে থাকা শিশির। এর চাইতে ভাল কবিতা আর হয় না। মাছের বাজারের দিকটা বিল্বমঙ্গলের ভুলভুলাইয়ার মতো মনে হয়। একবার ঢুকলে আর বের হওয়ার রাস্তা খুঁজে পান না। বোরোলি মাছের পিঠের ওপরে ওই লম্বা কালো দাগটা বা ধর গিয়ে মহাশোলের আঁশগুলো যেন হেরিং বোন স্টাইলে পাতা মাছের গায়ে। এমন মিঠে মাছ আর দুটি দেখেন নি। মোটমাট, বিল্বমঙ্গল একজন পোক্ত বাজারু।

আজকের দিনটাই অন্যরকম। শিবুর মাথায় রায়ডাক নদীর দুটো পাকা কালবাউস চাপিয়ে বাড়ি ঢুকলেন বিল্বমঙ্গল। মাঝে গাড়ি থামিয়ে তেজেন ডাক্তারকে নেমন্তন্ন করে এসেছেন, 'ভায়া, দুপুরে এসো আজ। হাত পুড়িয়ে রান্না করতে যেও না।' তেজেন ডাক্তার মোটেও হাত পুড়িয়ে খান না। এই জামবাড়ি টি-এস্টেটের চিফ মেডিক্যাল অফিসার। নিজের বাংলোয় ঠাকুর চাকর সবই আছে। কিন্তু অপরাহ্নে দুহাত দাবা বিল্বমঙ্গলকে খেলতেই হবে। তাছাড়া ভাল রান্নার স্বাদ একা উপভোগ করাটা ওঁর কাছে পাপের মত। যাই যাই করতে থাকা যৌবনের চৌকাঠে খাওয়া কমিয়েছেন ডাক্তার। তবু প্রাণের বন্ধুর আব্দার ফিরিয়ে দিতে পারেন না। সেই যুবক বয়েসে ডাক্তারি পাশ করে উত্তরবাংলায় চলে আসেন। আর ফিরে যান নি। ঘরসংসারও না।

কাঞ্চন ডাক্তার আসল ডাক্তার না। ব্রিজ কোর্স করা ডিগ্রি আছে বটে একটা কিন্তু মোটের ওপর হাতুড়ে, বেয়ার ফুটেড। দুএকটা নার্সিং হোমের রেসিডেন্সিয়াল ডাক্তার। মূল ইনকাম অ্যাবরশন থেকে। কাঁচা পয়সা একটু ঝনঝন করলেই 'বার' মুখি। চিকা আর কাঞ্চনের একই টার্গেট। আগ্রাওয়ালি। মেয়েটিও খেলে যাচ্ছে শরীর দুলিয়ে, চোখের ইশারায়। কাঞ্চন ডাক্তারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টাকা উড়িয়েই যাচ্ছে চিকা। অথচ ডিলটা আজই করতে হবে।

এখানেই পাকাপাকি রয়ে গেলেন। এই সবুজের মায়া কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। পারলেন না এই অঞ্চলের সিধাসাদা মানুষগুলোকে ছেড়ে যেতে।

আজকের দিনটাই অন্যরকম। সবে শিবু এবং কালবাউশ নিয়ে বাড়ি ঢুকেছেন বিল্বমঙ্গল, এমন সময়ে তাপসী ছুটে আসে বিল্বমঙ্গলের কাছে, 'বড়বাবু, সকালবেলায় রাধা কৃষ্ণের মন্দির থেকে বেরিয়েই রাঙা মা মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন গো, এখনও শুয়ে আছে। তেজেন ডাক্তারকে খবর দিতে লোক পাঠিয়েছি। বিল্বমঙ্গল জানের আজ দুইমাস সুহাসিনীর রজঃস্রাব বন্ধ কিন্তু এমনটা এর আগেও হয়েছে। তাই অন্য কোনও আশা উনি করেন নি। শোয়ার ঘরে গিয়ে সুহাসিনীর কপালে হাত রাখেন বিল্বমঙ্গল, 'কেমন আছো এখন, সুহাস?' সুহাসিনী উত্তর করেন না। কিন্তু আজকের দিনটাই অন্যরকম। আজ সুহাসিনীর নাকে গুঁড়ো সিঁদুর। আজ সুহাসিনীর মুখে আসন্ন মাতৃত্বের লাবণ্য। প্রণাম করে উঠে দাঁড়ানোর পর সুহাসিনীর চিবুক তুলে কপালে ওষ্ঠ ছোঁয়ালেন বিল্বমঙ্গল রায়। রায়বাড়ির গথিক খিলানগুলোতেও প্রাণ ফিরে এসেছে যেন। যেন আজ রাধামাধব মুখ তুলে চেয়েছেন। আজ আর বাগানে আসেন নি বিল্বমঙ্গল। পুকুরে জাল ফেলে তুলে আনালেন খলবল করতে থাকা মাছ। বিলোলেন বাগানের বাবুদের। মৎস্যমুখীর এই সংবাদ ছড়িয়ে গেল বাগান থেকে বাগান্তরে। কুলিলাইনে ধামসা বাজল, জ্যোৎস্নায় ভেসে গেল জামবাড়ি টি-এস্টেটের সন্ধ্যা।

যথাসময়ে রায়বাড়ি আলো করে একটি কন্যাসন্তান এল এই পৃথিবীতে।

বিল্বমঙ্গল রায় আদর করে মেয়ের নাম দিলেন রাধারানি।

মধুপুরে একটিমাত্র স্টেডিয়াম। বছরে একবার ক্রিকেট লীগ চলে, একবার ফুটবল। তখন সারা স্টেডিয়ামে মেরেকেটে একশ লোক। কিন্তু আজ সকাল থেকে উত্তেজনায় কাঁপছে মধুপুর। জেলা কালেক্টর, জেলা পুলিশ সুপারের আজ ঘুম নেই। এদিকে গোশালা মোড় থেকে ওদিকে তিস্তা ব্রিজ অবধি, যতদূর চোখ যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। মধুপুরের সব রাস্তা আজ স্টেডিয়ামে গিয়ে মিশেছে। সার্কিট হাউস থেকে স্টেডিয়াম পর্যন্ত একটা গ্রিন করিডর তৈরি করা হয়েছে। 'ট্রিপল আর'-কে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ফুলবাড়ির আর্মড্ পুলিশ লাইনের পুরো ব্যাটালিয়ন তুলে আনা হয়েছে সার্কিট হাউস পাহারা দেবে বলে। 'ট্রিপল আর' এই মুহূর্তে গোটা বাংলার হার্টথ্রব, নয়নের মণি। কে এই ট্রিপল আর? একসময়ের রেডিও জকি, পেজ থ্রি কাঁপানো এই বছর ছাব্বিশের মেয়েটি এখন ভারতের সবচেয়ে আলোচিত মোটিভেশনাল স্পিকার। রাজনৈতিক দলগুলো আগেও সন্দেহ করত, এখনও করে। কিন্তু 'ট্রিপল আর'-এর তাতে কোনও হেলদোল নেই। সারা ভারত, বিশেষত বাংলা জুড়ে 'ট্রিপল আর'-এর সরাসরি ভক্তের সংখ্যা দু কোটি ছাড়িয়েছে। স্রেফ সমীহ এবং সহ্য করা ছাড়া এখন কিছু করার নেই। 'ট্রিপল আর' মঞ্চে দাঁড়ালে এক অদ্ভুত হ্যালুসিনেশন। গণ হিস্টিরিয়া।

সার্কিট হাউসের এক নম্বর স্যুইটের দরজা এই মুহূর্তে বন্ধ। এবার আর ফ্লাইটে আসেন নি 'ট্রিপল আর'। আপ হলদিবাড়ি সুপারফাস্টে জলপাইগুড়ি আসা ইস্তক ঘরের দরজা বন্ধ। পারসোনাল সেক্রেটারির থেকে জানা গেছে সারা রাস্তা উনি জেনেরাল কামরার লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছেন। লোকাল এমএলএ, এমপি থেকে কেবল চ্যানেলের লোক কারোর সঙ্গেই দেখা করেননি 'ট্রিপল আর'। এই রহস্যের বেড়াজাল, এই না-ছোঁয়া দূরত্ব 'ট্রিপল আর'-কে আরও মহিমান্বিত করেছে। মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে মিথ ও মিথ্যের কুহক। প্রায় বারো ঘন্টা পরে ইন্টারকমে মেসেজ আসে ট্রিপল আর কথা বলবেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে। ডিএম ভি. আই. রাজু দক্ষিণের লোক। বত্রিশ বছর বয়স, শাসকদলের খুব ঘনিষ্ঠ। কিন্তু নির্দেশ আছে 'ট্রিপল আর'-এর এপিসোডে যাতে কোনও ইস্যু না হয়। আট বছরের আইএএস কেরিয়ারে আজকের দিনটাই সবচেয়ে চ্যালেঞ্জের। আইবি রিপোর্টেও কোনও অ্যাডভার্স কিছু নেই। সেন্ট্রাল আইবি থেকে কিছু নোট আসে নি। রাজু আন্দাজ করতে পারেন, ট্রিপল আর-এর সঙ্গে কোথাও দিল্লির একটা সূক্ষ্ম টিউনিং আছে। যদিও উনি একজন মোটিভেশনাল স্পিকার মাত্র। রেডিও জকির দুনিয়াজোড়া সুনাম ছেড়ে, বিজ্ঞাপনের এনডোর্সমেন্ট ছেড়ে, স্রেফ একজন মোটিভেশনাল স্পিকার। কোথাও ধর্ম নেই, রাজনীতি নেই তবু কাতারে কাতারে মানুষ 'ট্রিপল আর'-এর কথা শুনতে আসে।

'ইউ মে গেট ইন ডি এম সাহেব', দৃঢ় এবং রিনরিনে আওয়াজ ভেসে আসে এক নম্বর স্যুইট থেকে।

'ম্যাডাম, হোপফুলি এভরিথিং ইজ অলরাইট?'

'হ্যাঁ, সো ফার সো গুড। কিন্তু ডি এম সাহেব আমার দুটো মোবাইলেই যে আপনার হোম ডিপার্টমেন্টের নজর।'

'একেবারেই না, ম্যাডাম। এভাবে সরকার স্নুপ করে না। তারও একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া আছে।'

'যাক, ফরাক্কার মত এখানে যাতে কোনও ঘটনা না ঘটে, একটু খেয়াল রাখবেন। আমি তো মানুষের সঙ্গে দুটো কথা বলতেই আসি। আপনারা থাকুন আপনার মত, আমি আমার মত, বলেই দুহাত ওপরে তুলে হাই তুললেন ট্রিপল আর। কালো লেগিংস আর কালো বডি হাগিং ফুলস্লিভে বালিঘড়ির মতো দেখায় 'ট্রিপল আর'-কে। বেশ বোঝা যাচ্ছে কোথাও কোনও অন্তর্বাস নেই। পারফেক্ট জিরো ফিগারের মালকিন এই মেয়েটি। দুটো চোখ যেন তরল বোমা। ডিএম রাজু কোনও কথা না বলে উঠে দাঁড়ান। ট্রিপল আরের জনসমর্থন আর সরকারি ধৈর্যের টাইট রোপ ওয়াকিং-এর সময় এখন।

বেগুনটারি মোড়ের বাবা লোকনাথ সাইবার ক্যাফেটি মংরা মাতালের। মংরা মাতাল ঠিক ততটা মাতাল নয় যাতে করে নামের পরে এই শব্দটা যোগ করা যায়। আসলে মংরার মতে মাতাল মোটামুটি চার প্রকার, ছুপা মাতাল, সোসাইটি মাতাল, প্রকাশ্য মাতাল আর পচা মাতাল। মংরা নিজেই নিজের ক্যাটেগরি ঠিক করে নিয়েছে। প্রকাশ্য মাতাল। এককালের জেলার একনম্বর উইকেটকিপার, এখনও বেতের মত চেহারার ইন্দ্রাশিস মিত্র, বিকেলের দিকটায়, কাস্টমার একটু কমে এলে, বাবা লোকনাথ দশকর্মা ভাণ্ডারে বিশ্ব উষ্ণায়ন, চায়না-আমেরিকা ট্রেড ওয়ার এবং মধুপুর শহরের হাল হকিকৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। মংরার কবজিতে তিসো ঘড়ি, তার কোমর ঘিরে গুচ্চির বেল্ট, পরনে আর্মানির শার্ট। সাইবার ক্যাফের উপার্জন আর মংরার খরচের বহর, এর মধ্যে যতখানি পার্থক্য, ঠিক তার মাঝের জায়গাটুকু দিয়ে মধুপুরের টেমস করলা নদী বয়ে গেছে। সন্ধের ঠিক আগে, রণে বনে, জঙ্গলে যে যেখানেই থাকুক না কেন, পলাশবরণ নিয়োগী এবং বাপ্পা দেব লোকনাথ সাইবার ক্যাফেতে আসবেই আসবে। নিয়োগী বীমা কোম্পানির পদস্থ অফিসার, বাপ্পা ইনকাম ট্যাক্সের উকিল। তিন বন্ধুর মধ্যে সম্পর্কের রৌদ্রছায়া তবু এই তিনজনেই হরিহর আত্মা। আজ অবশ্য বাবা লোকনাথ সাইবার ক্যাফে বন্ধ। আদতে মধুপুরের বেশিরভাগ দোকানই আজ বন্ধ। মধুপুর শহর ছেয়ে গেছে 'ট্রিপল আর'-এর বাসন্তী রঙের পতাকায়।

মধুপুর থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে লাটাগুড়ির একটি ছোট্ট রিসর্ট। নিরীহ এবং সাদামাটা। সামনে একফালি লন। অযত্নের ছাপ সর্বাঙ্গে। বিকেলের আলো প্রায় মরে এসেছে। একটা রঙচটা মারুতি ওয়াগনআর রিসর্টের গেট পেরিয়ে লনের পাশে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে নেমে আসে এক বেঁটেখাটো মানুষ। শক্তপোক্ত চেহারা। ভাল করে নজর করলে বোঝা যাবে ভদ্রলোক নেপালি। দোতলার কোণের ঘরটায় তিনবার নক্ করলেন তিনি। ভেতরে মংরা মাতাল ওরফে ইন্দ্রাশিস মিত্র, সামনে খোলা মদের বোতল। ওল্ড মঙ্ক। ইন্দ্রাশিস হাত বাড়িয়ে স্বাগত জানায় মিলন গোম্বুকে,

'আপনার জন্যই বিকেল থেকে ওয়েট করছি

বেগুনটারি মোড়ের বাবা লোকনাথ সাইবার ক্যাফেটি মংরা মাতালের। মংরা মাতাল ঠিক ততটা মাতাল নয় যাতে করে নামের পরে এই শব্দটা যোগ করা যায়। আসলে মংরার মতে মাতাল মোটামুটি চার প্রকার, ছুপা মাতাল, সোসাইটি মাতাল, প্রকাশ্য মাতাল আর পচা মাতাল। মংরা নিজেই নিজের ক্যাটেগরি ঠিক করে নিয়েছে। প্রকাশ্য মাতাল। এককালের জেলার একনম্বর উইকেটকিপার, এখনও বেতের মত চেহারার ইন্দ্রাশিস মিত্র, বিকেলের দিকটায়, কাস্টমার একটু কমে এলে, বাবা লোকনাথ দশকর্মা ভাণ্ডারে বিশ্ব উষ্ণায়ন, চায়না-আমেরিকা ট্রেড ওয়ার এবং মধুপুর শহরের হাল হকিকৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। মংরার কবজিতে তিসো ঘড়ি, তার কোমর ঘিরে গুচ্চির বেল্ট, পরনে আর্মানির শার্ট।

ডিএসপি সাহাব।'

'আসতে দেরি হয়ে গেল, বুঝতেই পারছেন আজ মধুপুরের অবস্থা কতটা সেনসিটিভ। হাতে আর সময়ও বেশি নেই। ঠিক সাতটায় ট্রিপল আর সার্কিট হাউস ছাড়বেন। সার্কিট হাউসে আমার ডিউটি শুরু হবে ছয়টা থেকে। কাগজটা দিন, এক্ষুনি।'

ইন্দ্রাশিস একটা এ-ফোর সাইজের টাইপড্ পাতা বের করে তুলে দেয় ডিএসপি ডিআইবি গোম্বুর হাতে, 'কোডেড মেসেজ সাহেব, দেওয়ার সময় ট্রিপল আরকে বলে দেবেন বেশ কয়েকটা ব্রোকেন মেসেজ আসছে। কোথাও একটা ইনটারসেপ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে। ম্যানিপুলেটেড রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি দরকার। ফ্রিকোয়েন্সি হপিং আরও নিখুঁত হওয়া চাই।'

মাথা নাড়েন মিলন গোম্বু, 'এখন সাড়ে চার। ছয়টার মধ্যে সার্কিট হাউস পৌঁছতে হবে। ফোর্স ডিপ্লয়মেন্ট সেরে ফেলতে হবে ওভার ফোন। এসপি নিজে গোটা ব্যাপারটা সুপারভাইজ করছেন'।

এতদিনের অভিজ্ঞতায় ডিএসপি মিলন গোম্বু বুঝতে পারেন আসলে কোথাও একটা সলতে পাকানোর কাজ চলছে। সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স মেসেজগুলোও খানিকটা ওপর ওপর। 'কোড গ্রিন' সংগঠনের নামটা এখনও সেভাবে ছড়ায় নি। গোম্বু নিজেও বুঝতে পারেন না উনি সাদার দলে না কালোর দলে। নাকি সাদা আর কালো মধ্যেকার ধূসর এলাকায়। এটুকু জানেন সিকিম মনাস্টারির বৃদ্ধ মঙ্ক, অরফ্যানেজ থেকে তুলে এনে যিনি মিলনকে মানুষ করেছেন, পড়াশুনো শিখিয়েছেন, দেবতাতুল্য সেই মানুষটি আর যাই হোক পৃথিবীর খারাপ চান না।

সন্ধের মুখে কোথাও যেতে হলে তিনবন্ধুরই একটু রাফ ঢালাই দরকার হয়। নশুর গুমটিতে দেড় পেগের একটা রাফ ঢালাই দিয়ে তিনজনই স্টেডিয়ামের পথ ধরে। অজস্র বাসন্তী রঙের পতাকা চলেছে স্টেডিয়াম অভিমুখে। এ এক অদ্ভুত গণ হিস্টিরিয়া।

স্টেডিয়ামের মূল মঞ্চে এখন গানবাজনা হচ্ছে। ঠিক আটটায় মঞ্চে এলেন ট্রিপল আর। মুহূর্তে হাজার সমুদ্রের ঢেউ যেন একসাথে গর্জন করে উঠল। দুহাত ওপরে তুলে বরাভয়ের মতো করে ট্রিপল আর বললেন, 'শান্তম'। ঝিঙে বিচির মতো ছোট্ট ল্যাপেল ওঁর মুখের বাঁদিকে। একঘন্টা ধরে ট্রিপল আরের রিনরিনে আওয়াজ মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে স্টেডিয়ামের মানুষজনকে।

কীভাবে ভাল থাকবে এই পৃথিবী, মানুষ নিজের মনকে কেন আরও নিয়ন্ত্রণে আনবে, পশুপাখি থেকে গাছপালা সবাইকে ভাল রাখতে হলে মানুষের কী করা উচিত, এই নিয়ে একঘন্টার একটা হিপনোটিক স্পেল শেষ করে মঞ্চ থেকে নেমে নিজের স্পোর্টস প্যাজেরোতে উঠে সার্কিট হাউসে দিকে রওয়ানা দিলেন 'ট্রিপল আর'।

বিল্বমঙ্গল রায় এবং সুহাসিনী দেবীর একমাত্র কন্যা রাধারানী রে।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

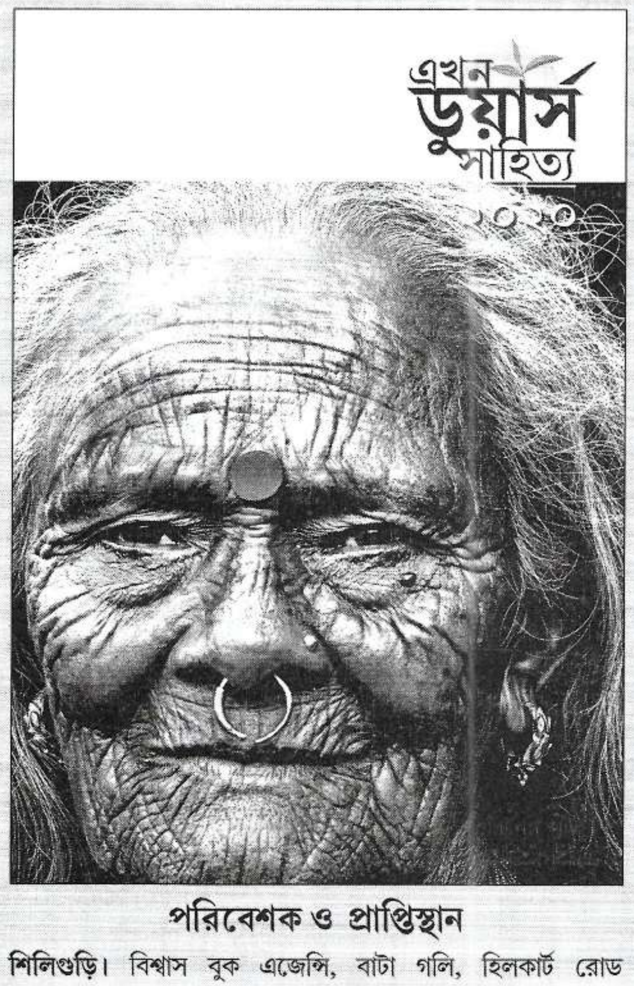

এ সময়ে বাংলার উত্তরে সাহিত্যচর্চার সেরা সংকলন

উপন্যাস

বিপুল দাস। তনুশ্রী পাল। অমিত কুমার দে। শুভময় সরকার। অভিজিৎ সরকার। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

গল্প

পীযুষ ভট্টাচার্য। অর্ণব সেন। অরুণাভ ভৌমিক। বিমল লামা। দিবাকর ভট্টাচার্য। গৌতমেন্দু রায়। তপতী বাগচি। সাগরিকা রায়। কল্যাণ গোস্বামী। রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়। সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য। দীপালোক ভট্টাচার্য। শাশ্বতী চন্দ। রম্যাণী গোস্বামী। সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। শ্বেতা সরখেল। রাখি পুরকায়স্থ। দেবপ্রিয়া সরকার। মানিক সাহা। রঞ্জন রায়। সন্দীপন নন্দী। সত্যম ভট্টাচার্য। সৌমিত্র চৌধুরী। সুব্রত চক্রবর্তী। শাঁওলি দে। হিমি মিত্র রায়। সৌগত ভট্টাচার্য। শতরূপা নাগপাল। ইপ্সিতা সোম। অগ্রদীপ দত্ত।

কবিতা

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত কবিতা। সন্তোষ সিংহের রাজবংশী কবিতাগুচ্ছ। সমীর চট্টোপাধ্যায়। অমর চক্রবর্তী। কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য। সমর রায়চৌধুরী। রাণা সরকার। বিজয় দে।

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস। সুজিত দাস। নিখিলেশ রায়। অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়। রত্নদীপা দে ঘোষ। সেবন্তী ঘোষ। অনিন্দিতা গুপ্ত রায়। সোমা বৈদ্য। সুদীপ্ত মাজি। সুবীর সরকার। নিঝুম ঠাকুর। অমিত দে। জয়শীলা গুহ বাগচী। মনোনীতা চক্রবর্তী। সৌমনা দাশগুপ্ত। স্বপ্ননীল রুদ্র।

শ্যামলী সেনগুপ্ত। শুক্লা রায়। সম্পা দত্ত দে। পাপড়ি গুহ নিয়োগী। সৌম্য সরকার। নীলাদ্রি দেব। মারুফ আহমেদ নয়ন। নির্মাল্য ঘোষ। অনুপ ঘোষাল। অভিজিৎ দাশ। দীপায়ন পাঠক। শক্তিপ্রসাদ ঘোষ। সুপ্রিয় চন্দ। প্রশান্ত নাথ চৌধুরী। অমিত পাল। হেমন্ত সরখেল। তুহিন শুভ্র মন্ডল। জ্যোতির্ময় মুখার্জি। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। মহুয়া। সন্দীপ শর্মা।

পরিবেশক ও প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি। বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড ৯৪৩৪৩২৭৩৪২ **জলপাইগুড়ি**। ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে ৯৭৩৩২৪৬৯১৩ **আলিপুরদুয়ার**। দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭ **কোচবিহার**। জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে ৯৪৩৪২১৭০৮৪ **মালদা**। অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি ৭৮৬৪৯৯৫৫১৫ **কলকাতা**। বিশাল বুক সেন্টার, ৪ টোটি লেন, নিউ মার্কেট। ৪০৬৪৪০৯৭ অথবা না পেলে যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে ৯৮৩০৪১০৮০৮।

সম্পাদক শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ৫১২ পৃষ্ঠার পেপারব্যাক। মূল্য ১৯৫ টাকা

ধারাবাহিক কাহিনি। পর্ব ৭

তাজ্জব মহাভারত

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

মধুক্ষরার মুখে যুধিষ্ঠির জানতে পারলেন ভুসুকুর নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ। ভীষ্মকে অনুরোধ করে শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে সতর্কবার্তা পাঠানর ব্যবস্থা হলো। কিন্তু ফল হলো না। কৌশলে ভুসুকুকে হস্তিনাপুর থেকে বের করে নিয়ে যমারণ্যের পথে যাত্রা করল পুন্ডরীকাক্ষ-অম্লরাজের বাহিনী। তাঁদের সুরক্ষার জন্য দুর্যোধনের নির্দেশে কতিপয় কৃষ্ণযোদ্ধা সঙ্গী হলো। ভূতমিত্রের আশ্রমে আর্য-অনার্য নিয়ে বিতর্ক বাঁধল। অদন্তের দলবল সরাসরি দুর্যোধনকে যুবরাজ বলার পক্ষে মত প্রকাশ করল। কিন্তু ভুসুকুর কোনও সূত্র পেলেন না ভূতমিত্র। রাতের বেলায় নকুল গোপনে এসে তাঁকে বলে গেল ভুসুকু অনুসন্ধানের দায়িত্ব স্বয়ং যুধিষ্ঠির গ্রহণ করেছেন। যমারণ্যের কাছাকাছি এসে আক্রমণের মুখে পড়ল পুন্ডরীকাক্ষরা।

২৬

কাক ভোরে ঘুম ভেঙে গেল মহাবলীর। কে জানি কক্ষের দ্বারে করাঘাত করছে। খুব দরকার না হলে এই সময়ে কেউ তাঁকে বিরক্ত করবে না। তবে কি কামরূপ রাজের কাছ থেকে কোন গুরুত্বপূর্ণ বার্তা এসেছে?

মহাবলী তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন বিছানা ছেড়ে। শরীরে গরম কাপড় জড়িয়ে বললেন, 'ভেতরে এসো।'

দ্বার একটু ফাঁক হল। একজন রক্ষী মাথা ঢুকিয়ে জানাল হস্তিনাপুরের একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজপুরুষ দেখা করতে এসেছেন। তাঁকে সসম্মানে অতিথি কক্ষে বসান হয়েছে। তিনি নিজের নাম বলেন নি। নিজেকে তিনি এমন ভাবে আচ্ছাদিত করেছেন যে মুখটাও দেখা যাচ্ছে না। তবে যে রথে চেপে তিনি এসেছেন তার চুড়ায় কুরু বংশের চিহ্নযুক্ত পতাকা শোভা পাচ্ছে।

মহাবলী পলকের মধ্যে কিছু একটা অনুমান করে বললেন, 'তাঁকে যথাযোগ্য আপ্যায়ণ করো। উষ্ণ পানীয় দাও। আমি এক্ষুনি অতিথি কক্ষে যাচ্ছি।'

রক্ষী চলে গেল। মহাবলীর সঙ্কেত পেয়ে দু-জন দাস তাঁর বেশভূষা নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করেছে। সে সব ধারণ করে তিনি আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালেন। নিজের সাজসজ্জায় সন্তুষ্ট হয়ে কোমরে তলোয়ার এঁটে হাঁটা দিলেন অতিথি কক্ষের দিকে। এত সকালে একজন হস্তিনাপুরী রাজপুরুষের দেখা করতে আসাটা বিরলের মধ্যে বিরলতর ঘটনা। কিন্তু মহাবলী অবাক হচ্ছেন না। তিনি যেন টের পেয়েছেন কে এসেছে। গট গট করে অতিথিকক্ষে প্রবেশ করে বহুমূল্য পশমবস্ত্রে আপাদমস্তক আচ্ছাদিত উপবিষ্ট পুরুষটির সামনে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর হাতজোড় করে বললেন, 'আমি জানতাম আপনি আমাকে স্মরণ করবেন। কিন্তু নিজে আসবেন তা ভাবি নি।'

রাজপুরুষ এবার তাঁর মুখের আচ্ছাদন সরিয়ে মৃদু হাসলেন। মহাবলী বিস্ফারিত চোখে বললেন, 'এ কী! আমি তো ভেবেছিলাম—!'

'বড়দা আমাকেই পাঠালেন। আমি অর্জুন।'

'আমার পরম সৌভাগ্য যে বীরশ্রেষ্ঠ মধ্যম পাণ্ডব আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য স্বয়ং এসেছেন।'

অর্জুনের চোখেমুখে এক ধরনের নমনীয়তা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর পরিচয় না জানা থাকলে অনুমান করা অসম্ভব যে তিনি কুরুরাজ্যের শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। বিবিধ অস্ত্রচালনায় নিপুণ। তাঁর গলার স্বরেও এক ধরনের কোমলতা আছে।

'বড়দা আপনাকে কোনও একটি বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন বলে জানি।' ধীর এবং পরিশীলিত উচ্চারণে বলতে লাগলেন অর্জুন। 'সে বিষয়ে আপনি কি কিছু জানতে পেরেছেন?'

'সাগরদেশের দূতাবাস সম্পর্কে আমি সংবাদ সংগ্রহ করেছি। সংক্ষেপে বলতে হলে সে দূতাবাসের কর্মিদের সঙ্গে পুন্ডরীকাক্ষের যোগাযোগ আছে।'

'ভুসুকু নামক ব্যক্তিটিকে অপহরণ করা হয়েছে মহাবলী!' অর্জুন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'আমারা নিশ্চিত যে তাঁকে সুকৌশলে হস্তিনাপুরের সীমানা থেকে বাইরে বের করা হয়েছে এবং সে ব্যাপারে স্বয়ং দুর্যোধন জড়িত বলে আমাদের ধারনা। তাঁর নির্দেশে রাজকীয় কৃষ্ণবাহিনীর একটি দল গতকাল হস্তিনাপুরের সীমানা পেরিয়ে যমারণ্যের দিকে যাত্রা করেছে। তাঁদের সঙ্গে পুন্ডরীকাক্ষ সহ আরো যোদ্ধা ছিল। আমাদের বিশ্বাস তাঁরাই ভুসুকুকে নিয়ে গেছে।'

পূবের আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছিল। অর্জুন তাঁর বক্তব্য জানিয়ে খোলা বাতায়নের সামনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। তিনি আসলে মহাবলীর কথার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তখন। কিন্তু মহাবলী বলার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছিলেন না সেই মুহূর্তে।

'বড়দা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি ভুসুকুকে উদ্ধার করবেন।'

মহাবলীকে নীরব থাকতে দেখে অর্জুন মূল কথাটা জানালেন এবার। যুধিষ্ঠির তাঁকে এটা বলার জন্যই পাঠিয়েছেন। কাজটা তিনি গোপনে করতে চাইছেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে লোকবল সংগ্রহ করা কঠিন। সেটা করতে গেলে সবাই জেনে যাবে। তাই তিনি মহাবলীর সহযোগিতা চাইছেন।

মহাবলী উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'যুধিষ্ঠিরকে সহযোগিতা করতে পারাটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু তিনি আমার কাছে ঠিক কী ধরনের সহযোগিতা চাইছেন?'

'বড়দা চাইছেন ভুসুকুকে উদ্ধার করার অভিযানে আপনি আমাদের সঙ্গী হবেন।'

'অবশ্যই! প্রয়োজনে আমি আমার অনুগত দক্ষ যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর সঙ্গী হতে পারি!'

'উনি আপনাকেই চাইছেন।' অর্জুন বাতায়ন থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন মহাবলীর দিকে। 'আমার পাঁচ ভাই কয়েকজন অনুগত লোক নিয়ে

গোপনে ওদের অনুসরণ করব। আপনিও সেই দলে থাকবেন। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হবে ওদের উদ্দেশ্যটা বোঝা। যমারণ্যের মধ্য দিয়ে ওরা কোথায় যাচ্ছে তা আমাদের জানতে হবে। আমরা সবাই ছদ্মবেশে যাব। দেখে মনে হবে একদল বণিক যাচ্ছে। খুব দরকার না হলে অস্ত্র ধারণ করব না আমরা।'

'আশা করি এই অভিযান শুরু হতে বিলম্ব নেই?'

'না। কারণ এরমধ্যেই ওরা অনেকটা এগিয়ে গেছে। হয় তো আজ দিনের প্রথম প্রহরেই যমারণ্যে ওরা প্রবেশ করবে। আপনি বণিকের ছদ্মবেশ ধারণ করে দু-তিনজন দক্ষ যোদ্ধাকে নিয়ে অবিলম্বে বেরিয়ে পড়ুন। হস্তিনাপুর সীমান্তে অপেক্ষা করবেন। আমরা অপরাহ্নের আগেই সেখানে পৌঁছে যাব। আপনি লক্ষ্য রাখবেন। আমাদের মাথায় হলুদ পাগড়ি থাকবে।'

মহাবলী পলকের মধ্যে বুঝে নিলেন কী হতে চলেছে। অর্জুন নিজের মুখ আবার উত্তরীয়তে ঢেকে ফেলেছেন। তিনি বেরিয়ে যেতে চাইছিলেন। মহাবলী মরিয়া হয়ে বললেন, 'ক্ষমা করবেন মধ্যম পাণ্ডব! দুর্যোধন কি আমাদের প্রতিপক্ষ?'

অর্জুন মুখের আবরণ সরিয়ে নিয়ে তাকালেন। তাঁর দৃষ্টিতে বিষণ্ণতা। মৃদু স্বর শোনা গেল তাঁর —'আপনার অনুমান দুর্ভাগ্যজনক ভাবে সত্য। কেবল দুর্যোধনই নয়, অঙ্গরাজ কর্ণ বর্তমানে হস্তিনাপুরে অবস্থান করছেন। তিনিও আমাদের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ হতে পারেন।'

'এ তো ভ্রাতৃবিরোধ!' মহাবলী চমকে উঠলেন। 'ক্ষমা করবেন! যদি তাইই হয় তবে এ বিষয়ে আমি নিরপেক্ষ থাকতে চাই। এটাই কামরূপরাজের নীতি।'

'সেটাই নীতি মহাবলী!' অর্জুন স্মিত হাসলেন। 'কেবল কামরূপ নয়, ভারতবর্ষের কোনও অসুররাজ্য কখনওই হস্তিনাপুরের আভ্যন্তরীণ বিবাদে হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু বড়দা কামরূপের সহযোগিতা চান নি। তিনি আপনাকে চাইছেন। পুন্ডরীকাক্ষ ধূর্জটিবর্মার যথার্থ পরিচয় আমাদের কাছে অজানা। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য কুরুবংশে বিভেদ সৃষ্টি। সম্ভবতঃ মহামায়াবি অম্লরাজ অঙ্গার এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। এমনও হতে পারে যে সাগরদেশের দূতাবাস তাঁদেরই নিয়ন্ত্রণে।'

'অবিশ্বাস্য!' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মহাবলী।

'ভূতমিত্রের আশ্রমের ছাত্রদের একটা অংশ দুর্যোধনের নামে ভক্তসঙ্ঘ স্থাপন করেছে।'

'এটা কি গুরুতর কোনও বিষয়?'

'না। কিন্তু ভুসুকু সে আশ্রমের মাহুত।'

অর্জুন নিজের মুখ দ্রুত ঢেকে নিলেন। এগিয়ে এসে হাত রাখলেন মহাবলীর কাঁধে। আর কিছু না বলে বেরিয়ে গেলেন অতিথিকক্ষ থেকে। সূর্য তখন উঠি উঠি। বাতায়নের মধ্য দিয়ে পূবদিকের রক্তিম আকাশ দেখা যাচ্ছিল গাছগাছালির ওপর দিয়ে। কনকন হাওয়া ঢুকছিল কক্ষে। মহাবলী বাতায়নের সামনে দাঁড়ালেন। সূর্যপ্রণাম করে বিড়বিড় করে বললেন, 'ভুসুকু কোথায় গেল তা জানার অধিকার আমার আছে। সে তো কামরূপের প্রজা।'

২৭

ভোর না হতেই যাত্রা শুরু হয়েছিল। যমারণ্যের সীমানার খুব কাছে এসে পড়েছে ওরা। সামনে একটি অপরিসর নদী। সামান্য জল আছে। নদীর পাড় হলেই যমারণ্যের শুরু। ভুসুকুরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে খুব জোর তিনশ হাত দূরেই অরণ্য। যোদ্ধারা নিজেদের মধ্যে নদী পাড় হওয়ার কৌশল নিয়ে আলোচনা করছিল। এবার তাঁরা লেগে পড়ল কাজে। ভুসুকু দেখল একটি গাড়ি থেকে বড় একখানা ধাতব হাঁড়ি নামান হল। হাঁড়িতে কিছু ছিল। খুব সাবধানে নামান হল সেটাকে। ঝটপট মাটি খুঁড়ে ছোট একটা উনুন বানিয়ে ফেলল একজন। সেটা জ্বালিয়ে তার ওপর বসান হল হাঁড়িটা। কিছুক্ষণ পর হাঁড়ি থেকে সবুজাভ ধোঁয়া বের হতে শুরু করল।

এরমধ্যে অম্লরাজ নিজের গাড়ি থেকে নেমে এসেছেন। তাঁর হাতে একটি ছোট থলে। একজন এসে একটি ভেজা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে দিল তাঁর। চোখদুটো বেরিয়ে থাকল কেবল। ভুসুকু লক্ষ্য করল কয়েকজন তীরন্দাজ একই ভাবে ভেজা কাপড়ে নিজেদের মুখ জড়িয়ে ফেলেছে।

'সবাই পঁচিশ-তিরিশ পা পিছিয়ে যান!'

পুন্ডরীকাক্ষ হাত তুলে আদেশ করলেন। তিরন্দাজ কয়েকজন ছাড়া সবাই পিছিয়ে গেল। অম্লরাজ থলে থেকে একপ্রকার বিশেষ চূর্ণ হাঁড়িতে মুঠো মুঠো করে ফেলতে লাগলেন। ধোঁয়ার রঙ বদলে গেল হালকা নীলে। পুন্ডরীকাক্ষ একটি ঢাকনা তুলে এনে বসিয়ে দিলেন হাঁড়ির মুখে। তারপর জ্বলন্ত কাঠগুলো উনুন থেকে বের করে এনে বাইরে রাখলেন। তীরন্দাজ কয়েকজন ইতিমধ্যে ধনুকে বিশেষ এক ধরনের শর যোজনা করেছে। ফলার বদলে তিরগুলির মাথায় একগোছা তুলো জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের একজন এগিয়ে এসে এবার হাঁড়ির ঢাকনা একটু সরিয়ে দিল। গল গল করে নীলবর্ণের ধোঁয়া বেরুতে লাগল হাঁড়ি থেকে ঝাঁঝাল সে ধোঁয়ায় ভুসুকুর চোখে জল চলে এল। জ্বালা করতে লাগল চোখ।

হাঁড়ির দ্রবণে তিরের মাথা ডুবিয়ে তা জ্বলন্ত কাঠগুলির কাছে আনতেই দপ করে জ্বলে উঠল। একঝাঁক জ্বলন্ত তির উড়ে গেল যমারণ্যের দিকে। আকাশপথেই নিভে গেল তিরগুলি। প্রচুর পরিমাণ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গাছপালার ফাঁক দিয়ে পড়ল অরণ্যের মাটিতে। গাছেও আটকে থাকল কয়েকটা। এইভাবে বার তিনেক গুচ্ছ গুচ্ছ তির নিক্ষেপণের পর দেখা গেল অরণ্যের মুখটা ধোঁয়ায় ভরে গেছে।

ভুসুকু বুঝতে পারল কৌশলটা। ধোঁয়াটি বিশেষ গুণযুক্ত। কোনও মানুষের পক্ষে সে ধোঁয়ায় চুপচাপ লুকিয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। অরণ্যে লুকিয়ে থাকা শত্রুদের টেনে বের করার পক্ষে অস্ত্রটি আদর্শ। একেই বোধহয় ধূম্রকূট বাণ বলে।

তির ছোঁড়ার পর অধীর আগ্রহে সকলে তাকিয়েছিল যমারণ্যের দিকে। কিন্তু কয়েকটা জানোয়ার ছাড়া আর কিছু বেরিয়ে এল না। এক সময় পুন্ডরীকাক্ষ মাথা ঝাঁকিয়ে অম্লরাজের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেউ নেই গুরুদেব! আমরা অগ্রসর হতে পারি।'

অম্লরাজ সম্মতি দিলেন। বাহিনী এগিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে লাগল।

তখনই অরণ্যের মুখ থেকে ঘন ছায়ার মত উঠে এল একটি প্রাচীর। কয়েক পলক স্তম্ভিত হয়ে থাকল ভুসুকুরা। তারপর বোঝা গেল প্রাচীর নয়। কৃষ্ণবর্ণের একসার মহিষ অরণ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। প্রতিটি মহিষের পিঠে একজন করে দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণের যোদ্ধা। তাঁদের দীর্ঘকেশ দুটি বেণীতে বিভক্ত। শরীরে ধাতববর্ম। হাতের ঢাল এবং সুতীক্ষ্ণ খড়্গ সকালের নবীন সূর্যালোক ঝকঝক করছে। সারির ঠিক মাঝখানে অতিকায় একটি মহিষে উপবিষ্ট একজন মহাবলশালী পুরুষ। তিনিই এই মহিষযোদ্ধাদের সেনাপতি।

পুন্ডরীকাক্ষ প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে যোদ্ধাদের সংযত থাকার নির্দেশ দিলেন। এই ভয়ঙ্কর মহিষযোদ্ধাদের মধ্যে কোনও তাড়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এরা অরণ্যের মুখেই লুকিয়ে ছিল এবং ধোঁয়ার কোনও প্রভাব তাঁদের মধ্যে পড়ে নি। তিনি লক্ষ্য করলেন মহিষযোদ্ধাদের একজন এগিয়ে আসছে। নিশ্চই কোনও বার্তা দিতে চায়।

পুন্ডরীকাক্ষ এগিয়ে গেলেন। মহিষারোহী নদী পেরিয়ে এসে গলা তুল ভাঙা ভাঙা হস্তিনাপুরি ভাষায় জানালেন, 'আমাদের অধিপতি, নরলোকের বিস্ময়, সমুদ্রসম উদার মহিষাসুর আপনাদের সঙ্গে বাক্যবিনিময়ে আগ্রহী। আপনারা ভালোবাসা চান, না যুদ্ধ চান?'

ভুসুকুদের দলে এবার বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। মহিষাসুরের নাম শোনেনি এমন লোক পাওয়া ভার। তিনি ভালোবাসায় বিশ্বাসী। অতি শক্তিশালী একটি বাহিনী নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান। ছোট ছোট অসভ্য-বর্বর রাজ্যগুলিকে সভ্য বানাবার প্রতিজ্ঞায় তিনি অটল। এ ব্যাপারে কেউ তাঁকে বাঁধা দেয় না। কিন্তু তিনি হঠাৎ যমারণ্যের প্রবেশপথে বাহিনী নিয়ে উদিত হবেন, এটা কেউ ভাবে নি।

'আমরা অবশ্যই ভালোবাসা চাইব।' পুন্ডরীকাক্ষ দূতকে জানালেন।

'খুশি হলাম।'

মহিষারোহী অরণ্যের দিকে হাতছানি দিয়ে সঙ্কেট পাঠালেন। অতিকায় মহিষটি এবার নড়ে উঠল। কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মহিষাসুর এগিয়ে আসতে লাগলেন। কাছাকাছি আসার পর ভুসুকু বুঝতে পারল মহিষাসুর মহাশক্তিধর হলেও তাঁর মুখেচোখে বেশ হাসি হাসি ভাব।

'মহামহীম মহিষাসুরকে প্রনাম!'

পুন্ডরীকাক্ষ ঝুঁকে শ্রদ্ধা জানালেন। বাহিনীর সবাই সেটাই করল। অম্লরাজ অঙ্গারও অনেকটা ঝুঁকে শ্রদ্ধা জানালেন মহিষাসুরের প্রতি।

'মহাশয়দের পরিচয়?'

গমগমে গলায় জানতে চাইলেন তিনি। পুন্ডরীকাক্ষ অম্লানবদনে বললেন, 'আমরা বণিক। যমারণ্য দিয়ে যাব বলে সঙ্গে রক্ষী নিয়েছি।'

'বণিকদের সঙ্গে এত উচ্চমানের অস্ত্র থাকে নাকি?' মহিষাসুরের গলায় কৌতুকের সুর। 'তবে আপনাদের অস্ত্রের ধোঁয়াটা হালকা। মাটি থেকে দু-হাত উঁচুতে উঠে থাকে। মহিষগুলোকে মাটিতে নাক ঠেকিয়ে বসিয়ে দিলেই এই অস্ত্র থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব। আমরা সেটাই করেছি। মোষের পিঠে উপুর হয়ে শুয়ে কেটে দিয়েছি আপনাদের অস্ত্র।'

'এ আপনার পক্ষেই সম্ভব।' পুন্ডরীকাক্ষের গলায় বিনয়ের বন্যা বইল। 'আসলে আমরা গতকাল আক্রান্ত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম অরণ্যবাসীরা প্রবেশ করা মাত্রই আমাদের আক্রমণ করবে।'

'তাঁদের আমি গতকাল ভালোবাসা দিয়ে জয় করে ফেলেছি। যমারণ্য এখন আমার অধীনে। হস্তিনাপুর গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রবাবুর সঙ্গে কথা বলে অধিকারটা বৈধ করে নেব।'

'যমারণ্য এখন আপনার অধীন?' পুন্ডরীকাক্ষ

বিস্ময় চেপে রাখতে পারলেন না।

মহিষাসুর হা হা করে হাসলেন। 'ওরা প্রথমে যুদ্ধ করতে এসেছিল। তখন বাধ্য হয়ে ওদের পরাজিত করলাম। তারপর বন্দী করে বোঝালাম যে এবার বলি দিলেই তো জীবনের সমাপ্তি। এর চেয়ে যদি ভালোবেসে অরণ্যটা আমায় দিয়ে দেয় তবে সবাই মিলে মজা করে দিন কাটান যাবে। ব্যস! ওরা মেনে নিল আমাকে। আজ থেকে ওদের নতুন জীবন শুরু। যমারণ্য এখন স্বর্গের চেয়ে নিরাপদ। কাল থেকে যারা এ পথ দিয়ে যেতে চাইবেন তাঁদের তিনটি করে স্বর্ণমুদ্রা জমা দিতে হবে। আমার অনুমান এর ফলে ওদের বছরে দেড়শত স্বর্ণমুদ্রা আয় হবে। এটা ওদের বাৎসরিক অর্থনীতির প্রায় এগার গুণ।'

'মাত্র তিন স্বর্ণমুদ্রায় নিরাপদ যমারণ্য! আপনি ধন্য! তবে কি আমরা যেতে পারি?'

'নিশ্চয়ই! তবে তাঁর আগে একটু প্রীতিভোজ হক। আমাদের কাছে পর্যাপ্ত খাদ্য আছে। নদীতীরে বনভোজন সেরে আগামীকাল প্রভাতে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করব।'

পুন্ডরীকাক্ষ তাকালেন অম্লরাজের দিকে। অম্লরাজ স্মিত হেসে সম্মতি দিলেন। যমারণ্যের মধ্য দিয়ে নিরাপদে যাওয়া নিয়ে আর সংশয় নেই। এই মুহূর্তে সেটা তাঁরা ছাড়া আর কেউ জানে না। সুতরাং আজকের দিনটা আনন্দ করা যেতেই পারে।

২৮

পাঁচ ভাইকে একসঙ্গে ঘরে ঢুকতে দেখে কুন্তী ভুরু কুঁচকে তাকালেন। অর্জুন বলল, 'আমরা পাঁচজন একটু পরিদর্শনে বের হব।'

'আনন্দের কথা। কবে বের হচ্ছিস তোরা?'

'আজকেই। একটু পরে।'

'আগে জানাস নি তো?'

'গতকাল ঠিক হল। বড়দা বলছিল, অনেকদিন একসঙ্গে কোথাও যাই না। দেশভ্রমণে বের হলে কেমন হয়?'

'হুম।'

কুন্তী মনে মনে হাসলেন। ছেলেরা সত্যি কথা বলছে না। তবে তিনি তাঁদের বিব্রতও করতে চাইলেন না। একটু গম্ভীর হয়ে কেবল বললেন, 'বড় হয়ে গেছ। রাতারাতি দেশভ্রমণের পরিকল্পনা মাথায় আসতেই পারে।'

'আমরা ছদ্মবেশে যাব।'

'অ্যাঁ!' কুন্তী এবার চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ছদ্মবেশ দেশভ্রমণের পরিকল্পনার অর্থ তাঁর মাথায় ঢুকল না।

'আসলে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ালে পরিদর্শনটা ভাল হয়। শাস্ত্রে বলেছে —কী বলেছে বলে দে না বড়দা!'

অর্জুনের কথায় যুধিষ্ঠির মুখটা একবার মুছে নিয়ে শুকনো গলায় বললেন, 'ইয়ে মানে শাস্ত্রে কিছু বলে নি। তবে ছদ্মবেশে বের হলে অনেক কিছু জানা যায়। হাজার হলেও আমরা তো রাজপুত্র।'

'বেশ।' কুন্তী আগের মতই গম্ভীর। 'কেমন ছদ্মবেশ হবে সেটা ঠিক হয়েছে?'

'বণিকের বেশ ধরব। সঙ্গে কয়েকজন বিশ্বস্ত যোদ্ধা থাকবে।'

'পিতামহ জানেন?'

'এইসব ছোটখাট ব্যাপার ওনাকে বলি নি মা।' কথাটা ভীমের মুখে শুনে কুন্তী তাঁর দিকে ফিরে ধমক দিয়ে বললেন, 'তোকে কে কথা বলতে বলেছে ভীমে! বিশ্বের কোন বিষয়টা তোর কাছে বড়?'

ভীম থতমত খেয়ে বলল, 'বেশি দূর তো যাচ্ছি না।'

'কদ্দুর যাচ্ছিস?'

'যমারণ্যের দিকে যাব।'

কুন্তী এবার রীতিমত উত্তেজিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের দিকে তেড়ে গিয়ে বললেন, 'ভীম যেটা বলল সেটা ঠিক? যমারণ্যের দিকে যাচ্ছিস তোরা? বণিকের ছদ্মবেশে? তোদের চিনতে না পারলে যমারণ্যের বাসিন্দারা যখন আক্রমণ করবে, তখন?'

'সেটা হলে কী যে ভাল হবে মা!' ভীমকে আহ্লাদিত দেখায়। 'একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ব্যাপার হবে।'

'হ্যাঁ! তাই হবে! তারপর সেখান থেকে অভিযোগ আসবে দেওরের কাছে। আমার মুখটা পুড়বে তখন!'

'তা হলে যুদ্ধ না করে বলব আমরা পঞ্চপাণ্ডব।' ভীম জানায়।

'দয়া করে তাইই করো। যেখানে পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন সেখানে ছদ্মবেশে থেকো না।'

'বাঃ! অতি মূল্যবান উপদেশ।' যুধিষ্ঠির তাড়াতাড়ি বলে ওঠে। 'আমরা এই উপদেশ অবশ্যই পালন করব।'

'খুশি হলাম। এবার তোমরা যেতে পারো।'

পাঁচ ভাই কুন্তীর কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। অনুমতি নেওয়ার ব্যাপারটা ভালয় ভালয় মিটে গেছে। এবার বেরিয়ে পড়তে হবে। যুধিষ্ঠির সবাইকে দ্বিতীয় প্রহর শেষ হওয়ার আগে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন। রক্ষী ক[illegible]ন এবং মালবাহী দুটি গাড়ি আলাদা আলাদা [illegible]য়ে পড়বে। পাঁচ ভাইও বের হবে একা একা। তারপর একটি নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হয়ে যাত্রা করবেন গন্তব্যের দিকে। সূর্যাস্তের আগেই বৃহত্তর হস্তিনাপুরের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে হবে তাঁদের।

দুঃশাসন একটু দূর থেকে লক্ষ্য করেছিল পঞ্চপাণ্ডব কুন্তীর ঘর থেকে বেরিয়ে নিজেদের মধ্যে কী সব আলোচনা করে আলাদা হয়ে গেল। এবার সে গুটি গুটি পায়ে প্রবেশ করল কুন্তীর ঘরে। কুন্তী তাঁকে জানালেন পাঁচ ভাই ভ্রমণে বের হচ্ছে আজ। তবে ছদ্মবেশের ব্যাপারটা তিনি বললেন না। সংবাদটা পেয়ে দুঃশাসন দ্রুত গিয়ে পৌঁছল দুর্যোধনের প্রাসাদে। তিনি স্মিত হেসে অনুজকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, 'কী সংবাদ! উত্তেজিত দেখাচ্ছে তোকে!'

দাদার চিত্ত প্রশান্ত দেখে দুঃশাসন বায়না ধরল, 'বলেছিলি একসঙ্গে মৃগয়ায় যাবি। কবে যাবি? ওরা তো আজকে ভ্রমণে যাচ্ছে!'

দুর্যোধন কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কারা যাচ্ছে?'

'পঞ্চপাণ্ডব একসঙ্গে আজ দেশভ্রমণে বের হচ্ছে। বড় মা বললেন যমারণ্যের দিকে যাবে।'

দুর্যোধনের স্নায়ু পলকের মধ্যে যাবতীয় আলস্য ঝেড়ে টানটান হয়ে উঠল।

'তুই ঠিক জানিস দুসু? যমারণ্যের দিকেই যাচ্ছে?'

'তাই তো বলল বড় মা।'

'অপ্রত্যাশিত সংবাদ দিলি রে দুসু! তুই আমার সোনা ভাই!'

দাদার প্রশংসায় দুঃশাসনের বুক ভরে উঠল। কিন্তু তাঁকে একটু অবাক করে দিয়ে দুর্যোধন কক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলেন পর মুহূর্তে। দুঃশাসন বুঝল যে দাদা সংবাদটা পেয়ে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। পরে দাদা নিশ্চই তাঁকে পুরস্কার দেবে!

দুর্যোধন ততক্ষণে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে রথে উঠে পড়েছেন। সারথির অপেক্ষা না করেই ছুটিয়ে দিয়েছেন রথ। হতে পারে পাণ্ডবদের যমারণ্যের দিকে যাওয়াটা কাকতালীয়। কিন্তু সেদিকে তাঁদের যেতে দেওয়া যাবে না। যে ভাবেই হক দেরি করাতে হবে। কিন্তু সত্যিই কি পাণ্ডবদের যমারণ্যের দিকে যাওয়াটা কাকতালীয়? যমারণ্যে পাণ্ডবদের কেউ আটকাবে না। তাঁদের পক্ষে অম্লরাজের বাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াটাও বিচিত্র কিছু হবে না।

তা হলে?

যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে রথ ছুটিয়ে কর্ণের বাসভবনে উপস্থিত হলেন দুর্যোধন। কর্ণ সব শুনে কিছুক্ষণ গভীর চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'না বন্ধু! ওদের দেশভ্রমণ পূর্বপরিকল্পিত নয়। আমি জানি আগামীকাল হস্তিনাপুর চিন্তন সমিতির একটি সভায় যুধিষ্ঠিরের প্রধান অতিথি হওয়ার কথা। আজ বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে যুধিষ্ঠির অতিথি হওয়ার জন্য রাজি হত না। দেশভ্রমণের সিদ্ধান্ত আকস্মিক।'

'যমারণ্যে যাওয়াটাই ওদের উদ্দেশ্য বলছ?'

'একদম তাই।'

'কিন্তু কেন? ওরা কি কিছু জেনে ফেলেছে?'

'কী জানবে?' কর্ণ বিড়বিড় করে বললেন। 'ভুসুকু ওদের কাছে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নয়। —নাকি আমরা ভুল ভাবছি বন্ধু?'

'ভুল?'

'কোনওভাবে কি ভুসুকুর সঙ্গে পাণ্ডবদের কোনও যোগাযোগ আছে?'

'কী যে বলো!' দুর্যোধন হাসলেন। 'হতে পারে ওরা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু ওরাও কুরুরাজপুত্র। যুধিষ্ঠিরকে তো যুবরাজ মানা হয়। কৌরব-পাণ্ডবদের সঙ্গে যাঁর-তাঁর হৃদ্যতা সম্ভব নয় কর্ণ!'

'তবে হয় তো কাকতালীয়।' কর্ণ মাথা নাড়িয়ে বলতে লাগলেন। দুর্যোধন কর্ণকে ভাল মত জানেন। তাঁর এবার মনে হল হয় তো কোনও সূত্রে কোনও যোগাযোগ থাকতে পারে। ভূতমিত্রের আশ্রমে অনুসন্ধান করা দরকার। সেখানে যাঁরা তাঁর নামে ভক্তসঙ্ঘ খুলেছে, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

কর্ণের দিকে তাকিয়ে দুর্যোধন বললেন, 'চলো তো, একবার ভূতমিত্রের আশ্রমে যাই!'

২৯

একসঙ্গে দুর্যোধন আর কর্ণকে প্রবেশ করতে দেখে আশ্রমিকদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। সংবাদ পেয়ে ভূতমিত্র বেজায় অবাক হয়ে যজ্ঞবেদী সজ্জার কাজ ফেলে পড়িমরি ছুটে এলেন। দুই বীরকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত আশ্রমিকরা তখন ভীড় করে দাঁড়িয়ে। ভূতমিত্র তাঁদের সরিয়ে দু-জনের সামনে এলেন। ওরা দু-জন রথ থেকে নেমে ভূতমিত্রকে প্রণাম জানাল। দুর্যোধন বললেন, 'বুঝতে পারছি যজ্ঞের আয়োজনে বিঘ্ন ঘটালাম। কিন্তু কানে এসেছে যে এখানে আমার ভক্তসঙ্ঘ গঠিত হয়েছে। তাই একবার না এসে পারলাম না। এ আমার মহা সৌভাগ্য!'

'আপনাদের আগমনে আমরা সম্মানিত। অনুগ্রহ করে একটু জলযোগের আয়োজন করতে দিন।

আপনারা প্রথম আমার এখানে এলেন।'

'প্রয়োজন নেই। আমি আর আমার বন্ধু কেবল সঙ্ঘের হোতার সঙ্গে একবার দেখা করব। কোথায় সে?'

ভীড়ের মধ্য থেকে অদন্ত এগিয়ে এসে দাঁড়াল। তাঁকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে একাধারে আপ্লুত এবং উত্তেজিত। এই সৌভাগ্য সে কল্পনাও করে নি।

'এই হলো হোতা।' ভূতমিত্র অদন্তকে দেখিয়ে বললেন। দুর্যোধন মিষ্টি হেসে তাঁকে কাছে ডাকলেন। 'আশ্রমের যজ্ঞক্রিয়ায় আমি কিছু দান করতে চাই। যদিও এসব ব্যাপারে আমার বিশেষ আগ্রহ নেই। কিন্তু অদন্তকে কিছু দেওয়া উচিত। আপনারা দানটি তাঁর সৌজন্যে গ্রহণ করবেন। দান সামগ্রি গ্রহণের জন্য আগামীকাল আমার কাছে লোক পাঠাবেন।'

আশ্রমিকরা বিপুল হর্ষধ্বনি দিয়ে তাঁদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল। ভূতমিত্রও আনন্দিত হলেন। স্বয়ং দুর্যোধন যখন দান করবেন তখন তা বহুমূল্য হতে বাধ্য।

অদন্তের সঙ্গ একটু ক্ষণ নিভৃত আলাপের অনুমতি নিয়ে দুর্যোধন আর কর্ণ একটু আড়ালে গেলেন। দুই মহাবীরের সামনে দাঁড়িয়ে বেচারা কথাই বলতে পারছিল না ভাল করে। দুর্যোধন তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, 'তোমার কথা পুন্ডরীকাক্ষ বলেছে অদন্ত। তুমি সহজ হও। ভুসুকু সম্পর্কে কী জান তা বলো আমাকে।'

'সে মাহুত!'

'আর কিছু? পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁর কি পরিচয় আছে?'

'সে মাছের ঝোল রান্না করে বাজারে বিক্রি করে। লোক এসে নিয়ে যায়।'

'এ তথ্য নতুন। তবে আরো বিশেষ কিছু যদি জেনে থাকো নির্ভয়ে বলো।'

'মধুক্ষরা জানতে পারে।'

'সে কে?'

'ভুসুকুকে সে ভালবাসে। ব্যাপারটা সত্যি নাও হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়।'

'তাঁর পরিচয়।'

'সারথি উচ্চকপালের মেয়ে।'

দুর্যোধন এক ঝলক তাকালেন কর্ণের মুখের দিকে। কর্ণ ইশারা করলেন।

'এবার তুমি যেতে পারো অদন্ত। তোমার কাজে আমি খুশি। পুরস্কার পাবে। তবে কোনও অবস্থাতেই গোপনীয়তা ভঙ্গ করবে না।'

কথাটা শেষ করে দুর্যোধন ধীর পায়ে অপেক্ষমান রথের দিকে এগিয়ে চললেন। কর্ণ অনুসরণ করল। আশ্রমিকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, ভূতমিত্রকে প্রণাম জানিয়ে তাঁরা শান্ত চিত্তে বেরিয়ে এলেন আশ্রম থেকে। রথ চালাতে চালাতে দুর্যোধন এক সময় কর্ণের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মাছের ঝোল বিক্রি করে এমন লোক কি হস্তিনাপুরে সংখ্যায় বেশি আছে সখা?'

'হস্তিনাপুরে এ বস্তু বিক্রি হয় বলে জানতাম না। অসুররা মাছ খায় জানি। তবে তাঁরা বিক্রি করে বলে জানি না।'

'তাহলে পাণ্ডবদের পাকশালে নিয়মিত মাছের ঝোল আসে কোত্থেকে? কে বানায়?'

কর্ণ এবার খুব অবাক হয়ে বললেন, 'তাই নাকি? পাণ্ডবরা মাছের ঝোল খাচ্ছে আজকাল!'

'ব্যাপারটা গোপনে হলেও সংবাদটা আমি পেয়েছিলাম। তখন গা লাগাই নি। এখন মনে হচ্ছে সে মাছ ভুসুকুর কাছ থেকেই আসে।'

'বলো কী?' কর্ণ রথের মধ্যে প্রায় লাফিয়ে ওঠেন। 'এ তো দুয়ে দুয়ে চার হে বন্ধু! মাছের সূত্রেই পাণ্ডবদের সঙ্গে ভুসুকুর যোগাযোগ হয়েছে।'

দুর্যোধনকে চিন্তিত দেখাল। মাছের সূত্রে যোগাযোগ অসম্ভব নয়। ভীমসেন খাদ্যরসিক। সে কারণে ভুসুকু মোটা পারিশ্রমিক পেতে পারে। কিন্তু তাঁর খোঁজে পাণ্ডবরা যমারণ্যে যাচ্ছে— এটা ভাবা কঠিন। প্রথম কথা তাঁরা কী ভাবে জানবে যে ভুসুকুকে সেদিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? কে নিয়ে গেছে, সেটাও জানবে কী ভাবে? ভুসুকু যে আগে একবার অপহৃত হয়েছিল— সে সংবাদ কি পাণ্ডবদের জানা?

দুর্যোধন লাগাম টানলেন। রথ থেমে গেল। কর্ণ বললেন, 'কী হলো?'

'ভুসুকুকে প্রথমবার অপহরণের ঘটনাটা কোনভাবে যদি পান্ডবদের জানা থাকে?'

একসঙ্গে দুর্যোধন আর কর্ণকে প্রবেশ করতে দেখে আশ্রমিকদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। সংবাদ পেয়ে ভূতমিত্র বেজায় অবাক হয়ে যজ্ঞবেদী সজ্জার কাজ ফেলে পড়িমরি ছুটে এলেন। দুই বীরকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত আশ্রমিকরা তখন ভীড় করে দাঁড়িয়ে। ভূতমিত্র তাঁদের সরিয়ে দু-জনের সামনে এলেন। ওরা দু-জন রথ থেকে নেমে ভূতমিত্রকে প্রণাম জানাল।

কর্ণ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ঠিক এ কথাটাই আমি ভাবছিলাম। যদিও সেটা অসম্ভব বলে তুমি জানিয়েছ। পাণ্ডবদের সঙ্গে ভুসুকুর তেমন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু যদি তা হয়ে থাকে তবে আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে পাণ্ডবরা কিছু কিছু জেনে গেছে।'

দুর্যোধনের চোখমুখ কঠিন হয়ে উঠল। তিনি সিদ্ধান্তে আসলেন মধুক্ষরা নামের মেয়েটিকে তুলে আনতে হবে। তাঁকে ভয় দেখিয়ে জেনে নিতে হবে সব কিছু।

দিন শেষ হয়ে গেল। সন্ধ্যার ছায়া নেমে এলো হস্তিনাপুর জুড়ে। বৃহত্তর হস্তিনাপুরের সীমানা ছাড়িয়ে যমারণ্যের পথে এগিয়ে চলা দশ-বারোজনের একটি দল একটি ছোট সরোবরের পাশে শিবির স্থাপন করল। তাঁদের মধ্যে ছ-জন আগুন জ্বালিয়ে তার চারদিকে গোল হয়ে বসল গল্প করতে। তাঁদের একজন মহাবলী। তিনি যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করলেন সব কিছু খুলে বলতে। যুধিষ্ঠির বলতে শুরু করলেন। ভুসুকুর সঙ্গে যোগাযোগ থেকে শুরু করে তাঁর অপহরণের কাহিনী, সাগরদেশের দূতাবাসের রহস্য, পুন্ডরীকাক্ষ-অম্লরাজের পরিকল্পনা, সৈন্ধবদের প্রতিশোধের কাহিনী, গৈরিকোৎপল রহস্য, ভুসুকুর দ্বিতীয় অপহরণ— সব বললেন তিনি। শুনতে শুনতে মহাবলীর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল।

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁরা কোনওভাবে দুর্যোধনকে গোটা পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িয়েছে।' যুধিষ্ঠির সব শেষে জানালেন। 'শুধু একটা ব্যাপার ধরতে পারছি না। ভুসুকুকে কেন তাঁদের প্রয়োজন?'

'আমাদের কর্তব্য ঠিক কী হবে যুবরাজ যুধিষ্ঠির?'

'ওরা ভুসুকুকে নিয়ে যমারণ্যে প্রবেশ করার পর ধীরগতিতে চলবে। কারণ যমারণ্যে প্রতিপদে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। আমরা ওদের ধরে ফেলতে পারব। সেক্ষেত্রে ভুসুকুকে উদ্ধার করতে পারাটা অসম্ভব কিছু নয়। আমাদের পরিচয় পেলে ওরা যুদ্ধে যাবে না। অবশ্য আমরা যে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করব না, এমন প্রতিশ্রুতি মা-কে দিই নি।'

'যদি না পাই ওদের?'

'তা হলে কী হবে তা এখনই বলা সম্ভব নয় মহাবলী! ষড়যন্ত্র কতটা জটিল এবং গভীর তা এখনো জানি না। যদি ভুসুকুকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারি তবে পুন্ডরীকাক্ষের দলবল আর হস্তিনাপুরে পা রাখার সাহস পাবে না। দুর্যোধনকে আমি তখন বোঝাতে পারব। কিন্তু তাঁদের না পেলে— ।'

কথা অসমাপ্ত রেখে যুধিষ্ঠির চুপ করে গেলেন। বাকিরাও কোনও কথা বলল না। রাতের আকাশে তখন কুয়াশা জমছে স্তরে স্তরে। উন্মুক্ত পরিবেশে শীতের দাঁত হয়ে উঠছে ধারাল। ঠিক সেই সময় যমারণ্যের প্রান্ত ঘেঁসে মহিষাসুরের বনভোজনে আকণ্ঠ পানভোজনের পর একে একে সবাই শয্যা গ্রহণ করেছে। স্বয়ং অম্লরাজও উৎকৃষ্ট সোমরস সেবনের লোভ সামলাতে না পেরে টলোমলো। পুন্ডরীকাক্ষও লঘুচিত্তে ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন দলের কে কেমন আছে। ভুসুকুকে ঘুমন্ত দেখে নিশ্চিত হলেন তিনি। সোমরস ভুসুকুও কম পান করে নি। এদের কেউই কাল সকালের আগে সুস্থ হবে না।

তবে মহিষাসুরের দলবল অতটা কাহিল হয়ে পড়ে নি। আকণ্ঠ সোমরস পান করেও তাঁরা বেশ টনটনে। তাঁদের শিবির থেকে গীতবাদ্যের শব্দ ভেসে আসছিল।

পুন্ডরীকাক্ষ তারকা খচিত আকাশের দিকে তাকালেন। যমারণ্যের পথ দ্রুত অতিক্রম করা যাবে। সময়ের আগেই ভুসুকুকে সম্মোহিত করার কাজটা হয়ে যাবে তা হলে। ভূতমিত্রের আশ্রম থেকেই শুরু হবে দুর্যোধনকে যুবরাজ রূপে প্রতিষ্ঠা করার কর্মকাণ্ড। তা থেকে আসবে বিদ্বেষ। হস্তিনাপুরের সিংহাসন নিয়ে কৌরব-পাণ্ডবের যুদ্ধ নিশ্চিত হওয়া কেবল সময়ের অপেক্ষা।

আকাশের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন পুন্ডরীকাক্ষ ধূর্জটিবর্মা। দুর্যোধন মহাবীর হতে পারেন, কিন্তু লোকটি আসলে মহাবোকা। অন্তরে তাঁর ক্ষমতার লোভ ভরপুর। ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে তাঁকে দিয়ে অসাধ্য সাধন করা যায়। ভীমসেনের ওপর তাঁর ভারি রাগ। ভীমকে হত্যা করার জন্য তাঁর কালকূট চাই। অম্লরাজ তাঁকে অবশ্যই কালকূট দেবেন। ভীম মরে গেলে কেবল দুর্যোধনের আনন্দ হবে— এমন নয়। পাণ্ডবরাও একটু দুর্বল হবে।

হস্তিনাপুরকে ধ্বংস করার প্রথম ধাপই হলো দুর্যোধনকে রাজা করা। পাণ্ডবরা দুর্বল না হলে তা হবে কীভাবে? *(ক্রমশ)*

গল্প

ক্ষমা করবেন স্যার

ছন্দা বিশ্বাস

আমি গনেশ চন্দ্র গলুই ওরফে গনা। তিন তিনবার মাধ্যমিকে ফেল করার পরে ঘর ছেড়ে তে' রাস্তার মোড়ে এসে দাড়ালাম। পাঠ্য বইএর কবিতার ছন্দের চাইতে তখন ভাল লাগতে শুরু করেছে পথের লোকেরদের চলার ছন্দ।

বিকেল হলেই সাইকেল নিয়ে টইটই করে ঘুরে বেড়াতাম। যাকে বলে রাস্তা মেপে বেড়ানো। তারপর ফিরে এসে পটার চায়ের দোকানে ঠেক নিতাম। ওটাই আমাদের আড্ডা মারার ঠিকানা হয়ে গেল। বসে বসে পরের পয়সায় চা-সিগারেট খাই আর গোঁফে তা দেই।

বাড়ি ফিরলেই মায়ের সেই এক গজর গজর, "কিছু একটা কর গনা। আমি চোখ বুজলে তোর কী হবে বুঝতে পারছিস? কী করে বাচবি তুই? কিছু একটা কাজকম্ম করে নিজের পায়ে দাঁড়া, আমি তাহলে মরেও শান্তি পাবো।"

বকবক করতে করতে একেবারে কানের পোকা নড়িয়ে দিল। অবশেষে একদিন বাধ্য ছেলের মতো কাজ শুরু করে দিলাম। ফুচকা বেচা।

ঠেলা গাড়িটা ঠেলতে ঠেলতে কালী মন্দিরের সামনে আমারই বাল্যবন্ধু কেলে পটার চায়ের দোকানের পাশে রাখলাম। পটাই আমাকে এই বুদ্ধিটা বাতলে ছিল। বলেছিল, "দ্যাখ গনা, এই তল্লাটে কিন্তু কোনও ফুচকার দোকান নেই। আর প্রতিদিন দ্যাখ মাইরি, কত সুন্দরী সুন্দরী সব মেয়েরা লাইন দিয়ে এই কালী মন্দিরে আসে পুজো দিতে, প্রতিমা দর্শন করতে। বিকেল হলেই এখানে সুন্দরীদের ঢল নামে। ওই যে সামনে একটা ছোটমোটো মিনি মার্কেট না শপিং মল কি একটা হয়েছে না, ওখানেই সবাই ঘুরতে আসে। তখন তোর ফুচকার দোকানে একবার না একবার ঢু দেবেই।"

পটার কথাটা সত্যি হল।

ভাগ্য কাকে বলে। দেখতে দেখতে কয়েক দিনের ভিতরে আমার নাম সরি আমার দোকানের নাম ফাটলঃ "গনার ফুচকা।"

বিকেল হতে না হতেই সুন্দরীদের লাইন পড়ে যেত।

কিন্তু কিছুদিন যেতেই একদিন ঘটে গেল চরম দুর্ঘটনা। সেদিন কী একটা উপলক্ষে মেলা বসেছিল। লোকে লোকারণ্য। ভিড়ে রাস্তা দিয়ে চলা দায়। দেখতে দেখতে আমার বাক্সের ফুচকা প্রায় শেষের দিকে। হঠাৎ কে একজন আবিষ্কার করল, তেঁতুল গোলা জলের হাড়ির ভিতরে নাকি একটা ইয়া বড়ো টিকটিকি ভাসছে।

সর্বনাশ! হঠাৎ আমার মনে পড়ল গতকালের তেতুল গোলা জলটা তো ফেলে দিতে ভুলে গেছি। মাটির হাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি বেশ বড়ো সাইজের টিকটিকি মরে পেটটা ফুলে ঢোল হয়ে জলের উপরে ভাসছে।

আমার সামনে তখন চারটে লাইনে মেয়েরা এবং ছেলেরাও ফুচকার শাল দোনা হাতে অপেক্ষা করছে। আমার বুকের ভেতরে তখন দুম দুম করে হাজার হাতুড়ির ঘা পড়ছে।

উপস্থিত যারা খাচ্ছিল, তারা ত সঙ্গে সঙ্গে হড় হড় করে বমি করে ভাসাল।

অবস্থা বেগতিক দেখে পটা চায়ের দোকান ফেলে আমার কাছে ছুটে আসে। তারপর আমার কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে একপাশে সরিয়ে কানে কানে বলল, "এক্ষুণি পালা, নইলে পাবলিকের প্যাঁদানিতে তোর লাশ আজ রাস্তায় পড়ে থাকবে।"

জনতার পিট্টির ভয়ে আমি তখন ফুচকার গাড়ি রেখে পগার পাড়।

দুই

অনেক বছর বাদে এই শহরে পা রাখলাম। সাগরনীল জিন্স আর ফুলকারি টি শার্ট চোখে সান গ্লাশ, হাতে স্টীলের বালা, চুল ঘাড় পর্যন্ত নামানো। বুকের উপরের দুটো বোতাম খুলে আমি এখন পুরো দস্তুর 'দাদা' বনে গেছি।

ইনকাম একটা জুটিয়ে নিয়েছিলাম- সিনেমা হলে টিকিট ব্ল্যাক করা। সঙ্গে জমির দালালি। তাতে রোজগারপাতি মন্দ হত না। কোত্থেকে সেদিন বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিড়ে গেল। 'জয় বাবা লোকনাথ' বলে কপাল ঠুকে একটা সিকিম বাম্পার লটারির টিকিট কেটে বসলাম।

দেখি এক টিকিটেই কেল্লা ফতে। এরপর জড়িয়ে গেলাম প্রোমোটারি ব্যবসায়।

সত্যি সত্যি লক্ষ্মী বাধা পড়ে গেল আমার কাছে। আমি এখন গনা মস্তান থেকে গনাদা, গনেশদা কিম্বা গনেশবাবু। লোকাল পঞ্চায়েত, বিডিও অফিস, মিউনিসিপ্যালিটি-সব এখন আমার হাতের মুঠোয়। বেশ কিছু রোড কন্সট্রাকশাণ, কিছু স্কুল এবং অফিস বিল্ডিঙের কাজ, কিছু শহরের ঝা চকচকে আবাসন তৈরী করার পরে আমার বেশ সুনাম হয়েছে।

তো সেদিন শাসক দলের একজন নেতা আমার অফিসে এসে বললেন, "গনেশ, এবারে কিন্তু তোমায় ভোটে দাঁড়াতে হবে। উপরওয়ালার নির্দেশে এবারে তুমি কিন্তু তুমি নোমিনেশান পাচ্ছ। প্রস্তুত থেক মানসিকভাবে।"

স্কুলের বিল্ডিং তৈরির ব্যাপারে কথা বলার জন্যে কত যুগ বাদে আজ হেডস্যারের মুখোমুখি হলাম। স্যার খুব খুশি হলেন যখন শুনলেন স্কুলের নতুন ভবন নির্মাণের দায়িত্ব আমি নিয়েছি। স্যার ওনার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। ওনার ঘর থেকে বিশাল স্কুল মাঠ, মাঠ পেরিয়ে মেইন গেট, বড়ো রাস্তা- সব দেখা যায়। এই কয় বছরে কত পাল্টে গেছে আমাদের স্কুলটা। হেড স্যার নবীন নায়েক ছিলেন পন্ডিত ব্যাক্তি। আমরা তাকে আড়ালে 'নায়ক স্যার' বলতাম। তার পঁয়ত্রিশ বছরের শিক্ষকতা জীবনে এই শহরে কত কৃতী ছাত্র আছে। বিদেশেও অনেকে সম্মান এবং সাফল্যের সাথে কাজ করছে।

না না করেও কাটাতে পারলাম না। সামনের মিউনিসিপ্যালিটির ভোটে আমাকে দাঁড়াতে হচ্ছে। ভোটের পরে শ্রী নদীর ব্রিজটাতে হাত দেবার কথা আছে। অবশ্য সেটার জন্যে আমাকে এই মুহূর্তে ভোটে জেতাটা খুব দরকার। এখানেও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী পরেশ নন্দী আছে। সে তো দশ কোটির এই প্রজেক্টটার জন্যে মুখিয়ে আছে। লোকমুখে শোনা যাচ্ছে, এগজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারকে এর ভিতরেই নাকি সপরিবারে ইউরোপ ঘোরার প্রস্তাব দিয়ে এসেছে বাড়িতে গিয়ে।

ইতিমধ্যে আমার নামে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যানার, পোস্টার, হোর্ডিং লাগানো হয়ে গেছে। নানান লিফ্লেট, পুস্তিকা, রাস্তায়, গাড়িতে, অফিস, দোকান বাড়ির দেওয়ালে, গাছের গুড়ির গায়ে, লোকেদের বাথ্রুমের দেওয়ালে আমার নাম --- সাইকেল চিহ্নে গনেশ চন্দ্র গলুই ওরফে গনাকে ভোট দিন।

আমি সত্যি একটা কেউকেটা বনে গেছি। কিন্তু আমার বিপক্ষে দাঁড়াচ্ছে কে? সেটাই তো এখনও জানা যাচ্ছে না। বিরোধী পার্টি এখনও পর্যন্ত তাদের দলের কারুর নাম ঘোষণা করেনি। একটা চাপা উত্তেজনা হচ্ছে। সেদিন পার্টি অফিসে কথাটা বলতেই বড়দা বললেন, "নো চিন্তা গনা, ওদের দলে আছেটা কে যে দাঁড়াবে? বিপক্ষের কাউকে ভোট দিতেই দোবো না। এবারে সব ভোট আমাদের।"

তবু কেন জানি আমার অস্বস্তিটা যেন কিছুতেই যাচ্ছে না। আমার বিপক্ষে কে দাঁড়াচ্ছে? নামটা জানা খুবই দরকার। যুদ্ধ করব, অথচ প্রতিপক্ষকে চিনব না, জানব না, তা কী করে হয়।

উত্তেজনার পারদ চড়ছে। সামনের সপ্তাহের ভিতরে সব কিছু জানা যাবে। ওইদিনই নমিনেশান জমা দেবার শেষ তারিখ।

সেদিন বিপক্ষের নাম ঘোষণা শুনে আমি চমকে উঠলাম। আমার বিপক্ষে নবীন নায়েক মানে আমাদের হেডস্যার দাঁড়াচ্ছেন।

আমি মুহূর্তের ভিতরে ফুটো হয়ে যাওয়া বেলুনের মত চুপসে যেতে থাকি। নিজেকে অবাঞ্ছিত, মরা মানুষের মত মনে হচ্ছে। কী বলার আছে ওনার বিপক্ষে? আমি তো ওনার নখেরও যোগ্য নই। এই শহরের প্রতিটা ইট, কাঠ, পাথর, প্রতি ইঞ্চি জমি জানে নবীন নায়েককে। বাতাসের প্রতিটা অনু-পরমানু তাকে চেনে। তার বিরুদ্ধে আমি

কি প্রচার করবো। যে কটা কথা বলব সব মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু কিছু তো বলতে হবে, নইলে আমার পার্টির লোক আমায় ছেড়ে দেবে না।

বড়দা এর ভিতরে আমার মনের কথা পড়তে পেরে শ্রী কৃষ্ণের ভূমিকা নিয়ে রাজনীতির ভাগবৎ ব্যাখ্যায় নেমে পড়েছেন। আমার মাথাটা এই মুহূর্তে ঘেটে 'ঘ' হয়ে গেছে। কী করব বুঝতে পারছি না। আগে যদি ঘুণাক্ষরেও টের পেতাম কিছুতেই এ পথে পা বাড়াতাম না। হেড স্যারের বিপক্ষে দাঁড়ানোর মতো ধৃষ্টতা সত্যি এই মুহূর্তে আমার নেই। তাছাড়া রাজনীতিতে আমি একেবারেই আনকোরা।

তিন

সেদিন রাতের বেলায় নিস্তব্ধ শহরে মোটামুটি সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন চুপিচুপি হাঁটতে হাঁটতে স্যারের বাড়ির দিকে পা বাড়াই। বর্তমানে স্যারের ছেলে বিদেশে থাকেন। স্ত্রী গত হয়েছেন বছর দুই হল।

অলি গলি পার হয়ে এ পাড়া সে পাড়া ঘুরে পলেস্তারা খসা জীর্ণ দোতলা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াই।

উড়ন্ত পর্দার ফাকা দিয়ে দেখলাম, ঘরের ভিতরে একটা নীল আলো জ্বলছে। আর বিছানা উপরে পরম নিশ্চিন্তে স্যার ঘুমাচ্ছেন।

ঘুমন্ত মানুষকে যে এতো সুন্দর দেখায়, আমি সেই প্রথম দেখলাম। মনে হচ্ছে কোনও দেবদূত ঘুমিয়ে আছেন। জাগাতে মন চাইছিল না। তবু আমি আস্তে আস্তে স্যারের জানালায় টোকা দেই, এক, দুই, তিন-

স্যার দেখি বিছানার উপরে ধড় ফড় করে উঠে বসলেন। তারপর টর্চ জ্বেলে এদিক সেদিক দেখতে লাগলেন।

আমি জানালা দিয়ে আস্তে আস্তে ডাক দেই, "স্যার, ও স্যার? দরজাটা একটু খুলবেন? আমি গনা বলছি, গনেশ গলুই।"

"এতো রাতে গনা তুমি?"

স্যার বাইরে এসে কোলাপসিবল গেটের তালা খুলে আমায় ভিতরে আসতে বললেন। আমি ঘরে ঢুকেই স্যারের পা দুখানা জড়িয়ে ধরলাম।

"ছাড়, ছাড়, কী ছেলেমানুষি করছ, কী হয়েছে বল?"

আমি হঠাৎ আবেগপ্রবণ হয়ে বলি, "স্যার, আপনার বিরুদ্ধে আমি কীভাবে প্রচারে নামব? আগে জানলে আমি সত্যি দাঁড়াতাম না। স্যার, আপনার বিপক্ষে যে কটা কথা বলতে হবে, অভিযোগ আনতে হবে- সবই যে মিথ্যে বলতে হবে, সেটা স্যার আমি কিছুতেই বলতে পারব না। এতোবড় অন্যায় কাজ আমি করতে পারব না স্যার।

তারপর ঢোক গিলে বললাম, স্যার, এবারে ইলেকশানটা জেতা আমার জীবনে একটা টার্নিং পয়েন্ট।

স্যার দেখলাম মাথা নীচু করে চুপচাপ কথাগুলো শুনলেন। তারপর আস্তে আস্তে কী যেন ভেবে বললেন, "অনেক রাত হয়েছে এখন বাড়ি যাও। তাছাড়া আমার শরীরটাও বিশেষ ভাল নেই। ক-দিন থেকে জ্বরে ভুগছি।"

স্যারের আদেশ আমি কখনো অমান্য করিনি। তাই আজও করলাম না। ধীর পায়ে বেরিয়ে এলাম।

দিন যতই এগিয়ে আসছে আমাদের প্রচার ততই তুঙ্গে। খোঁজ নিয়ে দেখি স্যার প্রচারে বের হন নি। তবে বিপক্ষের প্রচার, মিটিং, মিছিল, জন সংযোগ ভালই চলছে। এদিকে ইলেকশানের দিন যত এগিয়ে আসছে আমার ভিতরে উত্তেজনার পারদ ততই বাড়ছে।

আমি সত্যি একটা কেউকেটা বনে গেছি। কিন্তু আমার বিপক্ষে দাঁড়াচ্ছে কে? সেটাই তো এখনও জানা যাচ্ছে না। বিরোধী পার্টি এখনও পর্যন্ত তাদের দলের কারুর নাম ঘোষণা করেনি। একটা চাপা উত্তেজনা হচ্ছে। সেদিন পার্টি অফিসে কথাটা বলতেই বড়দা বললেন, "নো চিন্তা গনা, ওদের দলে আছেটা কে যে দাঁড়াবে? বিপক্ষের কাউকে ভোট দিতেই দেবো না। এবারে সব ভোট আমাদের।"

চার

সেদিন ঘুম ভাঙ্গল বড়দার ফোনে। ভোরবেলা সংবাদটা বড়দার মুখ থেকেই জানতে পারি। সত্যিই নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

এই সকালে নার্সিং হোমের সামনে পৌঁছে দেখি লোকের ঢল নেমেছে। আমি জনতাকে সরিয়ে আস্তে আস্তে নার্সিং হোমের ভিতরে যাই। দেখি সাদা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকা আমাদের হেড স্যার চিরনিদ্রায় শায়িত।

আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে কেঁপে উঠল। চোখের কোণ বেয়ে এক ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল সকলের অজান্তে। মনে মনে বললাম, "এবারেও আপনি আমায় পাশ করিয়ে দিলেন স্যার। তবে আপনার এই মৃত্যু আমি কামনা করি নি, স্যার। আমি শুধু আপনার রাজনৈতিক হার চেয়েছিলাম।"

হঠাৎ প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইলটা বেজে উঠল। দ্রুত মোবাইলটা বের করে দেখি বড়দার ফোন। কানে দিতেই জোর ধাতানি, "চোখের জল ফেলে আর ন্যাকামি করতে হবে না। মিডিয়া কিন্তু সব নজর রাখছে।"

খুব মৃদু গলায় 'সরি' বলে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে আসি।

বাইরে বেরিয়ে আসার সময়ে নানারকম গুঞ্জন কানে এলো। সকলে বলাবলি করছে, দিব্যি ভালো মানুষ কোনো রোগ ভোগ নেই, কী করে যে এমনটা ঘটল কে জানে!

শ্রী নদীর পাড়ে ইলেকট্রিক চুল্লিতে দাহ করা হল স্যারকে। দুইদিন ঠাণ্ডা ঘরে স্যারের ছেলের অপেক্ষায় রাখা হয়েছিল। স্যার শ্রাদ্ধ, মুখাগ্নি- এইস রিচুয়ালে বিশ্বাস করতেন না। তার ধ্যান জ্ঞান ছিল তার স্কুল এবং তার ছাত্র ছাত্রী। তবু স্যারের ছেলে এসে বাবার মুখাগ্নি করলেন। তারপর উকিল ডেকে স্যারের বাড়ি এবং সংলগ্ন জমি, বাগান সব স্কুলকে দান করে গেলেন। স্যার নাকি একটা ইচ্ছাপত্র লিখে রেখে গিয়েছিলেন।

একেবারে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হলাম। তবে অনুভব করলাম, এই জয়ের ভিতরে কোনও আনন্দ নেই। চেয়ারম্যান হিসেবে প্রথমেই যে কাজটা করলাম, চেন্নাই থেকে একজন স্কাল্পচারিস্টকে দিয়ে স্যারের একটা আবক্ষ মূর্তি বানালাম। স্কুলে ঢোকার মুখে মূর্তিটা বসান হবে ঠিক হল।

এদিনটা ছিল স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস। একশ বছর পূর্তি উপলক্ষে শহরের বহু গণ্যমান্য লোককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মূর্তিটা উন্মোচন করার দায়িত্ব পড়েছে আমার উপরে। স্কুল প্রাঙ্গণে বেশ বড়সড় প্যান্ডেল বাধা হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে চলবে নানান কর্মকান্ড। মাইকে ঘোষণা শোনা যাচ্ছে। ঘোষক একসময় আমার নাম ঘোষণা করলেন।

স্কুলের বর্তমান হেড স্যার, স্কুল পরিচালন সমিতির সেক্রেটারি এবং আরো কয়েকজন গণ্যমান্য লোকের সাথে আমি ধীর পায়ে এগিয়ে আসেন।

মূর্তিটার আবরণ সরিয়ে দেখি একেবারে নিখুঁত অবয়ব। সেই চোখ, চোখে কালোফ্রেমের চশমা, গোল গলা সাদা পাঞ্জাবি পরা আমাদের হেড স্যার।

পাশেই দাঁড়ানো একজন সিনিয়র ছাত্র একশটা গোলাপ দিয়ে বানানো মালাটা আমার হাতে দিয়ে বলল, স্যারের গলায় পরিয়ে দিতে। আমি স্যারের মূর্তিটার দিকে একবার তাকালাম। দেখি স্যার আগের মতোই ব্যক্তিত্বপূর্ণ চাহনিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার শরীরের ভিতরে কেমন একটা শিহরণ খেলে গেল।

স্যারের গলায় মালা পড়ানোর সময়ে মূর্তিটার গায়ের স্পর্শে আমি আবার কেঁপে উঠলাম।

বিশ্বাস করুন, সেদিন স্যারের মৃত্যুতে সত্যি আমার কোনো হাত ছিল না। জ্বর এবং শ্বাসকষ্ট নিয়ে সেদিন তিনি নার্সিং হোমে ভর্তি হলেন এবং শ্বাস কষ্টের সমস্যার জন্যে স্যারকে অক্সিজেন দেওয়া হল। পরে সি সি ইউ তে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং ভেন্টিলেশানে রাখার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল তৎপরতার সঙ্গে। পরে জানতে পারি সেই রাতেই স্যারের জন্য বরাদ্দ সিলিন্ডার থেকে অক্সিজেন শেষ হয়ে যায়। কথাটা জানাজানি হতেই সেই রাতে যার ডিউটি ছিল তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল সাময়িক ভাবে। আরো পরে জেনেছিলাম সাসপেন্ড হওয়া ব্যক্তিটি এই কাজের জন্য আগেই দু-লাখ টাকা পেয়েছিল।

মনে মনে বললাম, "আমায় ক্ষমা করবেন, স্যার। অঙ্ক আমি এখনো বুঝি না।"

কবির কলমে

প্রবেশ পথের গণ দুয়ার

রানা সরকার

সে পথ অরণ্যকে ছাড়িয়ে আর এক প্রত্যন্ত জনপদে মিশেছে। প্রবেশ পথের গণ দুয়ার । এখানেই থেমেছিল এসে দীর্ঘ পরিযান। গণ জমায়েতের পর পথগুলি দিয়ে ডুয়ার্সের প্রান্তিক জনপদের আলো আঁধারিতে উন্মুক্ত ছিল আঠারোটি দুয়ার। এখানেই পরিযানের দীর্ঘ মিছিলের জমায়েত। না, কোনও দাবি আদায়ের সনদ ছিল না তাদের হাতে। জনজাতি বেষ্টিত এক একটি জায়গা জড়ে অবাধ প্রকৃতি আর নিবিড় ছায়ায় তাদের গৃহকোণ, সাধের গেরস্থালি ঋতুচক্রে আবর্তিত হয়েছে। চৈত্রের শালবন উদার দাক্ষিণ্যে বুধুয়া মহালিদের কাছে টেনে নিয়েছে বারংবার। বরষার ভেজা চাঁদ আজও অস্পষ্ট আলো ফেলে রাতের গভীরতা মেপে নেয়। ঘরে ফেরার তাগিদে রাত শেষের নিঃশেষিত গ্লানি উগরে দেয় রাত পাখি। দূরের অন্য কোথাও পাখা মেলে মুক্ত বিহঙ্গ। এই জনপদে অরণ্যের মাদকতার সঙ্গে চা বাগানের একান্ত সবুজ অরণ্য বেলায় কখনও হারিয়ে যায়। ডুয়ার্সের গণদুয়ারের সবকটিতে নেমে আসে কখনও অমোঘ মৃত্যুর এক বিষণ্ণ খরা। সবুজের জনপদের রূপ বদল যেন অচেনা প্রান্তীয় পথমেরু হারিয়ে যায় অন্য কোথাও। এখানে শান্ত চার্চের ধর্মযাজকের কাছে দিগন্তের ভোরবেলা মৌনমুখর হয়ে চেয়ে থাকে। সময়ের এই দীর্ঘ পরিযানে সেই গোষ্ঠী ভুক্ত মানুষ বিরাম খোঁজেনি কোথাও। এগিয়ে যাওয়ার ডাকে আরেক জনগোষ্ঠীকে কাছে পেয়েছে। স্থান বিভাজনে বেছে নিয়েছিল তারা নিজস্ব বাসভূমি এবং শিকারের গহীন অরণ্য। মেচ, রাভা, সাঁওতাল ও ধীমাল গোত্রের মানুষজন বর্ণবহুল হয়ে উঠেছে কালের যাত্রায়। তিস্তা, রায়ডাক ও সংকোশ নদীর তীর ঘেঁষা জন-উপকূলে এক একটি গ্রামের জনজাতিদের আপন সংস্কৃতি মিলন মধুর হয়েছে। স্থায়িত্ব এখনও তার আবহকালীন। বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক অঙ্গনে মেচ, রাভা ও সাঁওতাল গোষ্ঠীর নৃত্য শৈলীতে জীবনগাথার ইশারায় আরেক জীবনের জগতে চলে যেতে হয়। উত্তরের এই জনপদে জাতিভিত্তিক বিভাজন নেমে এলেও বর্ণময় জনজাতিদের অবস্থানে বিমিত হতে হয়।

অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার বয়স ১৫০ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। ঔপনিবেশিক শাসনকালে পাহাড় অরণ্য ঘেরা এই জনজাতিদের বর্ণ বহুল সমগ্র ডুয়ার্স ছিল সেই সময় রংপুর জেলার আওতাধীন প্রান্তিক এক বিস্তীর্ণ জনপদ। ১৮৬৯ সালে ১লা জানুয়ারি জলপাইগুড়ি নামে এক পৃথক জেলার সূচনার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক এবং অবশ্যই অতি চেনা এক প্রাকৃতিক ভূগোল নতুন করে চিনিয়ে দিল। চিনিয়ে দিল তার পৃথক অবস্থানটিকে। কালের যাত্রা শুরুর সেই দিনটি হয়তো বা ঘন কুয়াশায় ঢেকেছিল। আলোছায়া পথ স্পষ্টত বিভাজিত জন-উপকূলে। পৃথক জাতিসত্তায় অসুর, বেদিয়া, ভুমিজ, টোটো, শেরপা, ডুকপা, ভুটিয়া, বীরহর, চিকবরাইক, হাজং, হো, লেপচা, কোরালোহার, মাহালি, মালপাহাড়ি, মেচ, মুণ্ডা, নাগাশিয়া, ওঁরাও, পাহাড়িয়া, রাভা, লিম্বু, তামাং প্রভৃতি বিচিত্র জনজাতির দীর্ঘ পরিযান আপাত শেষ হয়ে এসেছিল ফেলে আসা সুদীর্ঘ বছরের সম্মিলিত দিনগুলিতে। অবিভক্ত এই জেলায় বিভিন্ন জনজাতির শ্রেণীনির্ণীত ভাষা ছিল ১৫১টি। শ্রেণী অনির্ণীত ভাষা ১২টি এবং বিদেশী ভাষা ৮টি। ১৮টি দুয়ারের স্থানিক উল্লেখ আজও রয়ে গেছে জেলার ডালিমকোট, চামুর্চি সামচি, ময়নাগুড়ি, লক্ষী বা লাককি, বক্সা বা পাশাখা, ভলকা বা ভুলকা প্রভৃতি অতি পরিচিত এক একটি দুয়ার। প্রবেশের এই দুয়ার পথে একসময় প্রহরীরা সজাগ থাকত। পথ পেরনোর জন্য পথচারীদের রাজস্বের কর প্রদান ছিল বাধ্যতামূলক। মেরুকরণের এই দুয়ারগুলির অবস্থান আজও বিধৌত জনপদের শুষ্ক জলরেখায় নদী, অরণ্য এবং জনবসতি কালের দিকচিহ্নকে স্পষ্ট করে।

অনেক অনেক পরে আরেক পৃথক অবস্থান। একদিন কল সাহেবের মেম এর গাউন মধুমাসের খরতাপের চৈত্রের উদাসী হাওয়ায় দুলে উঠেছিল। কালপ্রহরী নিস্তব্ধ দুপুর নৈঃশব্দ্যের গভীরে ডুবেছিল। চা বাগানের চেনা এই দুপুর, সময়কে ছুঁয়েছে বারংবার। দিনের মধ্যাহ্ন থেকে অপরাহ্নের বার বেলা, কখনো বা রামধনু বিকেলের ছায়া এসে পড়তো পাহার থেকে নেমে আসা পথপ্রান্তের স্বচ্ছতোয়া নদীগুলিতে। নদী, অরণ্য ঘেরা পাহাড়ের সানুদেশে বিচিত্র জনজাতির বসতি জলপাই-ডুয়ার্সকে এক আবহকালীন জনপদে যুক্ত করেছে। সূচনা পর্ব থেকে এই জনপদকে ঘিরে দীর্ঘ পরিক্রমণ ও মায়াবী প্রদক্ষিণ এক পরম স্থানিক উপলব্ধি এনে ডুয়ার্সের সমস্ত দুয়ারগুলিকে খুলে দিয়েছিল একদিন। আজও এই অনন্তকালীন পথরেখা ধরে মানুষের যাত্রাপথ দিগন্তকে স্পর্শ করে। মূলত প্রকৃতির রাজ্য থেকে ডুয়ার্সকে আবিষ্কার অবধি এর প্রসার ও পরিধিকে সময়ের প্রয়োজনে বাড়িয়ে নিয়েছিল আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষ। এখানকার জনজীবনে প্রকৃতির উদারতায় গড়ে উঠেছিল শান্তশ্রী লোকালয়। এই সঙ্গতিপূর্ণ জনজীবন আজও তাই এক নিস্তরঙ্গ হ্রদের সঙ্গে তুলনীয়। অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার প্রাকৃতিক ঔদার্যে জীবনের মোহময় আবেশ তৈরি হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে এক নরম অনুভূতিতে এই স্থলভূমিটিকে আপন ভেবে যুগ যুগ ধরে মানুষের প্রবেশ ঘটেছে। উন্মুক্ত ১৮টি দুয়ার ছিল মানুষের প্রবেশদ্বার। এক একটি গণদুয়ার।

কালের প্রবাহে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ভূগোল বদলে গেছে। পরিযানে আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষ শুধু নয়, পার্শ্ববর্তী বঙ্গজ সংস্কৃতির ভিন্নতা নিয়ে ছিন্নমূল মানুষের আগমন ঘটেছে এইখানে।

ভাষা সংস্কৃতিরই বাহন। লোকায়ত জীবনের সংস্কৃতির উঠোনগুলি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে পূর্ণতা লাভে সক্ষম হয়ে উঠেছিল। সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এখানে বয়ে চলেছে ত্রি-ধারার এক অন্তহীন প্রবাহ। সংস্কৃতির এই প্রবাহধারায় রয়েছে আদিম সংস্কৃতি, লোক সংস্কৃতি এবং শিষ্ট সংস্কৃতি। লোকায়ত সংস্কৃতির বড় অংশটি এখনও মৌখিক সাহিত্যের মাঝে চলমান এবং পরিবর্তনধর্মী। এই কারণেই সহমর্মিতা ও সহধর্মিতায় ডুয়ার্সের মিশ্র সংস্কৃতিতে রয়েছে পৃথক এক গৌরব। ভাষা, বি-ভাষা, এবং উপ-ভাষার এক গতিশীল প্রবাহে এই বিরাট জনজীবনে বর্ণময় ঐতিহ্যে রাজবংশী উপ-ভাষা বহুভাষাভাষি জলপাইগুড়ি জেলার এই আঞ্চলিক উপ-ভাষাটি এক স্বত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করলেও কালান্তরে মিশ্র সংস্কৃতির জনাকীর্ণ ভূমণ্ডলটিকে উজ্জীবিত করেছে। লোকসংস্কৃতির অন্য এক পৃথক ঘরানার সঙ্গে যুক্ত হয়ে উত্তরের এই লোকজীবনে মিশ্রিত হয়েছে গোয়াল-পারীয়া ঘরানার লোকগীতি। সংস্কৃতির মেরুকরণ ঘটলেও এক অভিন্নতায় লোকআঙিনায় বিস্তৃত হয়েছে অমল লোকসংস্কৃতির মুক্তধারা। আন্তরিক এবং নিবিড় বিষন্নতায় এখানের জনজীবনকে আজও দোলা দেয় আবেগপূর্ণ প্রাণোচ্ছাসের প্রতীকী ভাবনার চিরদিনের লোকগান "তোমরা গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধুরে।"

জেলার সার্ধশতবর্ষের আলোকে আবার এক বিভাজিত অংশ নিয়ে ডুয়ার্সের আলিপুরদুয়ার জেলার সূচনা হল। ১৮৬৯-এ জেলা জলপাইগুড়ি কার্যত অখণ্ড ডুয়ার্সকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল। ২০১৪ সালের ২৫শে জুন আলিপুরদুয়ার জেলার

যাত্রা শুরুর মধ্য দিয়ে ডুয়ার্সের জনজাতিপূর্ণ এলাকাগুলি প্রশাসনিক পৃথক অস্তিত্বে আলাদা জেলায় প্রান্তিয় জনপদের ৬টি ব্লক (১) আলিপুরদুয়ার-১ (২) আলিপুরদুয়ার-২ (৩) ফালাকাটা (৪) মাদারিহাট (৫)কালচিনি (৬) কুমারগ্রামদুয়ারকে যুক্ত করে নেয়। ঘটনাবহুল এই জনপদের লোকায়ত জীবনের সঙ্গে যে জনশ্রুতি জড়িয়ে আছে তারই বাস্তবতায় উঠে এসেছে বৈচিত্র্যপূর্ণ স্থানিক পরিচিতি এবং নামকরণ। একবিংশ শতকের প্রথম পর্বে জেলা বিভাজনে অমরত্ব পেল ইতিহাসের ধারাবাহিকতা। ১৮৬৪ সালে দ্বিতীয় ভুটান যুদ্ধে ইংরেজরা ডুয়ার্স দখল করে নিল। ১৮৬৫ সালের ১১ই নভেম্বর সিনচুলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বক্সায়। চুক্তির ফলে দুয়ার অঞ্চল এল ইংরেজদের দখলে। এরপর বক্সাদুয়ার মহকুমার মর্যাদা পায়। ১৮৬৯ সালের ১লা জানুয়ারি জলপাইগুড়ি জেলা সৃষ্টির প্রাথমিক পর্বে মহকুমা পর্যায়ক্রমে কখনও ফালাকাটায় এবং বক্সাতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। অবশেষে ১৮৭৬ সালের ৬ই জুলাই আলিপুরদুয়ারে স্থায়ী মহকুমা গড়ে ওঠে। ডুয়ার্সের এই বৃহৎ অঞ্চলটি সিনচুলা চুক্তির আগে ভুটানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৃহত্তর ডুয়ার্সে এই অংশটি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তথা ইংরেজদের অধীনে আসে। ইতিহাসের ধূসর এই পথ ধরে সেদিনের পরিবর্তিত পরিস্থিতি আমাদেরকে আজও সচকিত এবং রোমাঞ্চিত করে তোলে। সামগ্রিক ভাবে সেদিনের সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন ছিল অবশ্যম্ভাবী। ডুয়ার্স বিভাজিত নয়। জেলা বিভাজনেও একই অস্তিত্ব নিয়ে জনজাতির অবস্থান এবং ঐতিহ্য আর্থ-সামাজিক বিকাশের পথে অনেক অন্তরায়ের মধ্যেও এক বলিষ্ঠ স্বকীয়তা ভবিষ্যতের পথচলার ক্ষেত্রে আশাবাদী করে তোলে।

পুরাণের নারী

মাদ্রী অনুচ্চারিত দৃঢ়চেতা এক প্রেমিকার নাম

শাঁওলি দে

মহাভারতের কাহিনীর ভিত যেসব চরিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে পাণ্ডু অন্যতম। ধৃতরাষ্ট্রের ভাই পাণ্ডুর দুই স্ত্রী, কুন্তী আর মাদ্রী। এদের পাঁচ সন্তান অর্থাৎ পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম না হলে মহাভারত আদৌ রচিত হত কিনা সন্দেহ আছে।

পাণ্ডুর দুই স্ত্রীর মধ্যে কুন্তী বহুল চর্চিত হলেও মাদ্রী যেন কিছুটা কম উচ্চারিত। এর কারণ হিসেবে বলা যায় মাদ্রী পাণ্ডুর প্রিয়তমা পত্নী হলেও কুন্তীর মত ধর্মাপরায়না, তেজস্বী ছিলেন না কখনোই, বরং সুন্দরী মাদ্রীর প্রেমিকারূপই আমাদের সামনে বারবার ফুটে ওঠে। মাদ্রী কম আলোচিত এর আরেক কারণ হল স্বল্প জীবনরেখা, যার ফলে মাদ্রীর পরবর্তী জীবনযাপন কেমন হত তা আমাদের কোনওভাবেই জানা সম্ভব হয় না।

পাণ্ডু ও কুন্তীর বিয়ের পর ভীষ্ম আরও বংশবিস্তারের জন্য বাহ্লীকবংশীয় শল্যের বোন মাদ্রীকে পছন্দ করেন। শল্য তখন ওঁদের বংশের নিয়মানুযায়ী ভীষ্মের কাছ থেকে ধনরত্ন, হাতি ঘোড়া পণ্যরূপে নিয়ে মাদ্রীকে ভীষ্মের হাতে তুলে দেন। ভীষ্ম তাঁকে হস্তিনাপুর নিয়ে গিয়ে পাণ্ডুর সঙ্গে বিয়ে দেন।

পাণ্ডু বীর রাজা ছিলেন, যুদ্ধে জয় লাভও করেছিলেন অনেক। কিন্তু তাঁর আসল আগ্রহ ছিল মৃগয়ায়। ভীষ্মের অনুমতি নিয়েই তিনি দুই পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে বনে চলে গেলেন। ধনরত্ন, রাজ্যসুখের ওপর কোনও মোহ ছিল না পাণ্ডুর। হিমালয়ের দক্ষিণের পাহাড়ের কাছে এক শালবনে ওঁরা বাস করতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র খাদ্যসহ নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়মিত পাঠাতেন ওঁদের। মনের সুখে দিনের পর দিন শিকার করতে লাগলেন তিনি।

এমনই চলছিল, হঠাৎই শিকার করতে গিয়ে পাণ্ডু একদিন এক হরিণ ও হরিণীকে সঙ্গমরত অবস্থায় দেখলেন। দেখামাত্রই তিনি পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করলেন ওদের। তৎক্ষণাৎ সেই হরিণ ও হরিণী মনুষ্যরূপ পেল, আসলে ওঁরা ছিলেন এক ঋষিকুমার কিমিন্দম ও তাঁর স্ত্রী। তেজস্বী ঋষিকুমার রেগে গেলেন, পাণ্ডুকে বললেন শিকার করা রাজধর্ম হলেও মৈথুনরত হরিণকে কোনও পাপিষ্ঠই এভাবে মারে না। ঋষিকুমার আরও বললেন, যেহেতু পাণ্ডু জানতেন না সেই হরিণ আদতে ব্রাহ্মণ, তাই ব্রহ্মহত্যার পাপ তাঁর হবে না, কিন্তু তিনি এই বলে শাপ দিলেন পাণ্ডুকে যে, যে মুহূর্তে পাণ্ডু কোনও স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করবেন, তখনই তাঁর মৃত্যু ঘটবে। এরপরই ওই ঋষি ও তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু ঘটল।

শোকগ্রস্থ পাণ্ডু তখন কাতর হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। তখনও পর্যন্ত পাণ্ডু ছিলেন নিঃসন্তান, তাই সন্তান ধারনের আর কোনও উপায় না দেখে তিনি স্থির করলেন তাঁর পক্ষে হস্তিনাপুরে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। তার বদলে কঠোর তপস্যা করবেন তিনি। তাঁর এই সিদ্ধান্তকে যথাযোগ্য সম্মান দিলেন দুই স্ত্রী কুন্তী ও মাদ্রী। ধর্মপত্নীর যা কর্তব্য তা করাই স্থির করলেন তাঁরা এবং সমস্ত অলংকার ব্রাহ্মণদের দান করে অরণ্যবাসী হলেন। তাঁরা নানা জায়গায় ঘুরে উত্তর হিমালয় হয়ে গন্ধমাদন পর্বতে গেলেন। সেখান থেকে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর হয়ে হংসকূট পর্বতে কিছুদিন বাস করে শতশৃঙ্গ পর্বতে গেলেন। কৃচ্ছসাধনের জন্য কঠোর তপস্যায় বসলেন পাণ্ডু, এবং ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মর্ষিদের মতই প্রবল শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। বহু ঋষির সঙ্গে তাঁর পরিচয় গড়ে উঠল। তাঁদের মুখেই একদিন ব্রহ্মলোকের মহাসভার কথা শুনে পাণ্ডু ভাবলেন তাঁর স্বর্গপ্রাপ্তির এই এক উপায়। পাণ্ডু যেহেতু নিঃসন্তান তাই স্বর্গ তাঁর জন্য নয়। তিনি ঋষিদের বললেন তপস্যার দ্বারা দেব ও ঋষি, মানুষের ঋণ থেকে তিনি মুক্ত হয়েছেন ঠিকই কিন্তু পুত্র না থাকায় পিতৃঋণ থেকে মুক্তি পাওয়া তাঁর হয় নি। ঋষিরা তখন তাঁকে আশ্বাস দেন অদূর ভবিষ্যতে সর্বগুণসম্পন্ন পুত্র হবে তাঁর। কিন্তু দুই স্ত্রীকে নিয়ে দুর্গম পথে যাওয়া উচিৎ নয়।

ব্যথিত হলেন পাণ্ডু। একান্তে স্ত্রী কুন্তীকে ডেকে বললেন যেকোনও উত্তম ব্রাহ্মণ দ্বারা পুত্র উৎপাদন করতে। প্রথমে অনিচ্ছে প্রকাশ করলেও স্বামীর আদেশে পরপর তিনবার ধর্মরাজ, বায়ু ও ইন্দ্রকে আহ্বান করে তিনটি পুত্রের জন্ম দিলেন কুন্তী। তাঁরাই হলেন যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন।

এদিকে সপত্নী কুন্তীকে তিনটি সন্তানের জন্ম দিতে দেখে মাদ্রী দুঃখ পেলেন। হয়ত বা ঈর্ষাকাতরও খানিকটা। পাণ্ডুকে গিয়ে ধরলেন তিনি, কুন্তীর মত তিনিও হতে চান মা। পাণ্ডুর কাছে বরাবরই প্রিয় ছিলেন মাদ্রী। প্রেয়সী স্ত্রীর অনুরোধ ফেলতে না পেরে কুন্তীকে অনুরোধ করলেন মাদ্রীকে সন্তানসুখের উপায় বলবার জন্য। কুন্তী তখন মাদ্রীকে বললেন, তাঁরও কোনও দেবতাকে স্মরণ করে সন্তান উৎপাদন করা উচিৎ। মাদ্রী তখন অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয়কে স্মরণ করলে নকুল ও সহদেব নামে তাঁর যমজ ছেলে হয়।

এরপর কিছুদিন সুখেই কাটে সবার। কুন্তীই মূলত দেখভাল করতে লাগলেন পাঁচ সন্তানের। একদিন পাণ্ডু ও মাদ্রী বনে ঘুরছিলেন। বসন্তের প্রকৃতির শোভায় মুগ্ধ হচ্ছিলেন দুজনই। মাদ্রীকে সেদিন লাগছিলও অপরূপা। বহুদিন পর কামার্ত হলেন পাণ্ডু। ভুলে গেলেন সব অভিশাপের কথা। এগিয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করলেন মাদ্রীকে। মাদ্রীও মুহূর্তে বিস্মৃত হলেন ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা। স্বামীর ডাকে সাড়া দিলেন তিনিও। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হল পাণ্ডুর।

আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন মাদ্রী। সেই চিৎকার শুনে ছুটে এলেন কুন্তীও। মাদ্রীকে স্বামীর হত্যারক বলে তিরষ্কার করে উঠলেন ও নিজে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে চাইলেন।

এইখানে মাদ্রীর দৃঢ়চেতা মনোভাবের পরিচয় মেলে খানিকটা। কুন্তীকে সহমরণে যেতে বাধা দেন তিনি। যেহেতু তাঁর জন্যই স্বামীর মৃত্যু সেজন্য সহমরণে তাঁরই যাওয়া উচিৎ। পাপ স্খালনের জন্য যমালয়ে গিয়ে মাদ্রীই করবেন স্বামীর সেবা। এর সঙ্গে মাদ্রী এও জানালেন তাঁর পক্ষে কুন্তীর তিনপুত্রকে নিজের সন্তানের মত মানুষ করা অসম্ভব। পক্ষপাতিত্ব এসেই যাবে, অন্যদিকে কুন্তী কোনওদিনই তা করতে পারবেন না। এই কথা বলার মধ্যেও মাদ্রীর চরিত্রের এক বিশেষ দিক ফুটে ওঠে। অন্য কোনও রমনী হলে হয়ত নিশ্চিত রাজসুখ ছেড়ে, সন্তানসুখ ছেড়ে এত বড় ত্যাগ স্বীকার করা সম্ভব হত না। নিজেকেও ঠিকই চিনেছিলেন মাদ্রী। তিনি জানতেন যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনকে তিনি বরাবর বৈমাত্রের স্নেহই দিতে পারতেন যা কুন্তী নকুল-সহদেবকে কোনওদিনও পারতেন না। নকুল ও সহদেবের জন্য তিনি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। এই কথা ভেবেই তিনি মন্ত্রবলে স্বামী পাণ্ডুর সঙ্গে সহমরণে গেলেন আর এক মুহূর্তে চরিত্রটি অনন্য হয়ে উঠল।

বেঁচে থাকলে মাদ্রীর চরিত্রের আর কোনও দিন ফুটে উঠত তা বলা যায় না ঠিকই তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় তেজস্বী, ধর্মপরায়ণা কুন্তীর ছায়ায় বরাবর ঢেকেই থাকতেন তিনি। যে কোনও নারীরই সামান্য ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া কি খুবই অনুচিত?

ছোটখাট দোষ ত্রুটি থাকলেও প্রেমিকা ও স্ত্রী হিসেবে কর্তব্যবোধের দিক থেকে মাদ্রী সবসময়ই স্মরণীয়।

উত্তরের উপকথা

একটি গীতিকার কিস্‌সা

কর্মময় দিন, শান্ত রাত, ভাতের পাতে দুটি ভালোমন্দ, ন্যায্য মজুরি, হকের ভিটে— এটুকুই ছিল স্বপ্নটা, এসবের জন্যই লড়েছিল ওরা। আজও তাদের জোতজিরেতে চোরা সম্প্রীতির কুলকুল। অমুক জোতের মুসলিম নেতা হিন্দুর ভোটে জিতছেন, তমুক জোতের হিন্দু বিয়েতে মুসলিম পড়শি পাত পেড়ে খাচ্ছেন। গেঁয়ো কালীমন্দিরে হেলান দিয়ে নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে আছে মৌলবীর ঘর, বিধর্মী ছেলেকে বুক চিতিয়ে ধর্মপুত্র পরিচয় দিচ্ছেন বাপ। ভাগাভাগির বিষ ঢালতে না পেরে উন্নয়ন বা আচ্ছে দিন কেউই ধরা দিচ্ছে না, জোতদারের কাছ থেকে আদায় করা পাট্টায় যে গেরস্তি গজিয়েছে তার আগউঠোনে শাঁখ বাজলে পাছমুড়োয় আজান উঠছে, এও তরাই এর আরেক মুখ।

নকশালবাড়ির আন্দোলন অনেক কারণে ব্যর্থ হতে পারে কিন্তু বাংলা বৌদ্ধিক সমাজে তার যত অবদান আছে সেকথা অস্বীকার করা যাবে না কিছুতেই। কত সাহিত্য ওপার থেকে চলে এসেছে, কত কাব্য গান উপন্যাস নাটক চলচ্চিত্র এপাড় থেকে ওপাড়ে গিয়েছে, হিসেব নেই। আজ যখন ভূমিপুত্রের সামনে উচ্চারণ করি, নকশাল কী মশাল/আসমান জ্বলছে/কিসানের ক্ষোভে আজ/হিমালয় টলছে তিনি নির্বোধ হাসি হাসেন। কিন্তু জাতের কথা উঠলে হাসি থামিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে উত্তর দেন, চাষার আবার জাত কী? চাউল কিনির গেইলে কি পুছ করেন, হেন্দুয়ে ধান বুনাছে নাকি মোসলায়?

চমৎকার জীবনদর্শন! রোমাঞ্চিত হই।

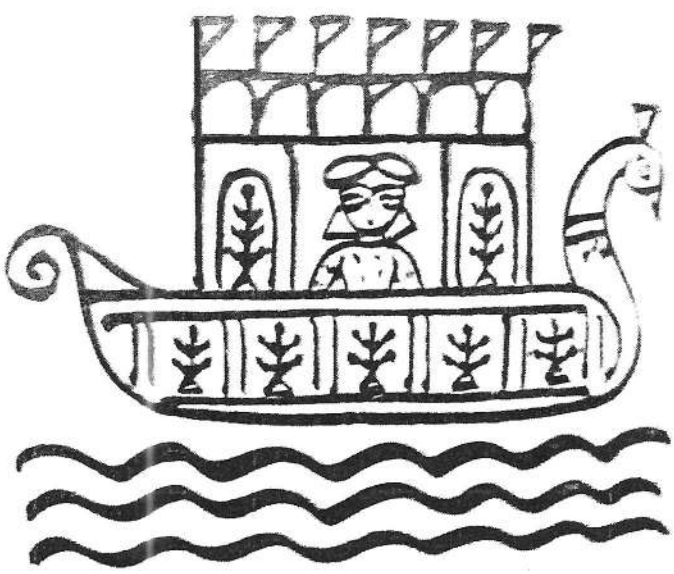

যিনি গল্পটির উল্লেখ করলেন, পেশায় কৃষক, নেশায় দোতরাবাদক। গল্পেরও প্রতি ছত্রে জাতধর্মের গণ্ডী প্রেমজলে ধুয়ে মুছে সাফ। যাঁরা ঈশ্বর আল্লা রং চিহ্ন নিয়ে বৃথা চুল ছেঁড়েন তাঁদের যেন বিদ্রুপ করে লোককথা। যেন বলতে চায়, 'ঐহিকে লোক ভিন্ন ভিন্ন/অন্তিমে সব একাঙ্গী'।

গীতিকা আসলে কাহিনি-নির্ভর লোকগীতি। সাজনবাজন সরিয়ে দিলে তার কাঠামোটি গল্পেরই। লোকগল্পের। পূর্ববঙ্গ গীতিকা ডুয়ার্সের পত্রিকায় আসতেই পারে, যদি চাষা নিজেই তা মুখে মুখে বয়ে আনেন। আয়না বিবির বাপও ছিলো চাষা। গরীব, হতাশ, বৃদ্ধ চাষা। চাচাতো ভাই জোতজমা কেড়ে নিয়েছে, মোড়লে দখল করেছে ফসল। থাকার মধ্যে আছে এক পরম রূপসী কন্যা আয়না। তা সে আয়না একদিন বড় হলো, যৌবন পড়ল, কাঁখে কলসি নিয়ে জল আনতে গেল নদীর ঘাটে। চান করে জল নিয়ে ভেজা কাপড়ে ঘরের পথে রওনা দিলো।

তারপর?

তারপর আরেক ভিনদেশি চাষার ছেলে উজ্জ্বল সাধু ডিঙা সাজিয়ে বাণিজ্যে যাচ্ছিল। নদীর ঘাটে সে আয়নাকে দেখল। আয়নাও সাধুকে দেখল। দু'জনের মধ্যেই সমান অনুরাগ জন্মালো।

দিন যায়। আয়নার বাপজান মারা গেলে সে আর গ্রামে থাকতে পারল না। দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়র বাড়িতে গিয়ে কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটাতে লাগল।

কিছুদিন পর উজ্জ্বল সদাগর (সাধু) বাণিজ্য করে ফেরার পথে আয়নার গ্রামেই নৌকা নোঙর করল। মনে মনে আশা, আয়নাকে দেখতে পাবে। কিন্তু সকাল থেকে সন্ধ্যে পার হয় আয়নার দেখা নেই। তখন সে পাগলের মতন গ্রামের ভিতরে গিয়ে আয়নার খবর নিল। কেউ বলতে পারল না আয়না কোথায় গেছে। ঘরে ফেরার পথ ভুলে সে আয়নাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

ওদিকে উজ্জ্বলের মা ছেলের আশায় আঁচল পেতে পীরের কাছে সিন্নি মানত করলেন। হতভাগিনি জানত না তার ছেলে আয়নাবিবির জন্য উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। আজকাল সে লোকের দুয়ারে ভাত মেগে বেড়ায়।

একদিন উজ্জ্বল সাধু ভাতের মাঙন চেয়ে এক গৃহস্থের উঠোনে চিৎকার করতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল আয়না বিবি। দুজনকে পেয়ে দুজনের আনন্দ আর ধরে না। তখনই আয়নাকে বিয়ে করে নিজের ঘরে নিয়ে গেল উজ্জ্বল। কিছুদিন তাদের সংসার ভারি সুখে চলল। অরন্ত ছরন্ত (শ্রান্ত) উজ্জ্বল কাজ থেকে ফিরলে আয়না 'কাছেতে খাড়াইয়া' গায়ে বাতাস করে, 'ঘরুয়া মৈষের দই' আর 'ঠান্ডা নদীর পানি' খাইয়ে স্বামীর সেবা করে। কিন্তু সুখের ভাতে ছাই পড়ল।

ফের বছর উজ্জ্বল সাধু বাণিজ্যের জন্য প্রবাসে গেলে খবর এলো ঝড়ে নৌকাডুবি হয়ে সে মারা গেছে। এ খবর শুনে আয়না পাগল হয়ে পথে পথে ঘুরতে লাগল। অল্পদিন কী অনেক দিন কে জানে, ঘুরতে ঘুরতে এক সময় সে হাওরের বালুচরে গিয়ে পড়েছে, এমন সময় কুরুঞ্জিয়া নামে এক বেদের দল চরের কোণে নৌকো বাঁধল।

কুরুঞ্জিয়া মেয়েরা নানারকম মশলা ফেরি করে গ্রামে গ্রামে ব্যবসা করত, পুরুষেরা রেঁধেবেড়ে তাদের খাওয়াত। আর নৌকার দাঁড় টানত। আয়নাকে দেখে তাদের মনে ভারি দয়া হল। তারা তাকে নৌকায় আশ্রয় দিল এবং আয়নার স্বামীকে গ্রামে গ্রামে খোঁজার চেষ্টা করতে লাগল।

তিনটি বছর এইভাবে কাটার পর একদিন এক মইষালের মুখে তারা খোঁজ পেল উজ্জ্বলের ভিটের। স্বামীর ঘরে পরদিনই গেল আয়না। ভিটেয় গিয়ে আয়নার বুক দুরুদুরু। নিজে হাতে লাগানো মেহেদির গাছটা তেমনই আছে। কিন্তু সে ঘর আর তার নেই। তার স্বামী আবার বিয়ে করেছে, সতীনের কোনে সোনার পো'।

শ্বাশুড়ি আয়নাকে চিনতে না পারলেও আন্দাজ করলেন এই সেই আয়না। যদি এটাই সত্যি হয় তাহলে তিনি আদরের আয়নাকে কিছুতেই যেতে দেবেন না, বুকে আগলে রাখবেন।

আয়নার তখন পাগলপারা দশা। আশা গেছে বাসা গেছে কীসের টানে আর এখানে থাকবে। সে উন্মত্তের মতন কুরুঞ্জিদের নৌকোয় ফিরে গিয়ে চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, এ দেশ ডাকাতের দেশ। এখানে থাকা চলবে না। অগত্যা কুরুঞ্জিরা নৌকো ছেড়ে দিল।

মাঝনদীতে মাথার ওপর গাংচিল ঘুরছে। আয়না মনে মনে প্রার্থনা করল স্বামী যেন এ খবর জানতে না পায়। যেন নূতন স্ত্রীপুত্র নিয়ে সুখী হয়।

কিন্তু হায়, একথা শুনে গাংচিলের মন এতই গলে গেল, তারা গিয়ে উজ্জ্বলকে খবর দিল, তোমার পংখিনী বাসা খুঁজতে এসেছিল, কিন্তু কেউ অভাগিনীকে থাকতে বলেনি।

শোকে পাগল হয়ে সাধু মামুদ উজ্জ্বল আয়নাবিবির খোঁজে বনবাসী হল। তার তল্লাশ আজও ফুরিয়েছে কিনা কেউ জানে না।

সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য

রাসায়নিক রস

চিন্তন বৈঠক

(স্থান মহাশ্মশান। চিতার আগুনে মঞ্চ আংশিক আলোকিত)

ব্রহ্মদৈত্য: আমার শালা পৈতে আছে। পৈতে মানে নাগরিকত্বের প্রমাণ। সুতরাং আমার কোনও চাপ নেই বাপু। তবে একটা কথা বলি। রাজনীতিবিদদের তোরা এমন মাথায় তুলেছিস যে তাঁরা নিজেদের আইনস্টাইন-রবি ঠাকুর ভাবছে।

কবিভূত: শুনছি যারা পদ্য লেখে ছবি আঁকে তারা সব হতাশমার্কা পাব্লিক।

একানড়ে: অমন কথা বলিস নি। মুখ্যমন্ত্রীর শততম বই বেরুচ্ছে।

পেত্নীসুন্দরী: বই ব্যাপারটা কেউ পড়ে কেউ খায়। এখন তলিয়ে দেখতে হবে যিনি বলেছেন তিনি পাঠক না খাদক?

স্বর্গতভক্ত: উনি পাকিস্তানের টাকায় বই লেখেন। আমি প্রমাণ করার জন্য এক্ষুনি একটা লিঙ্ক দিতে পারি।

ব্রহ্মদৈত্য: বাজে কথা বলো না বৎস্য! পাকিস্তানের কপি রাইট কেবলমাত্র ভারতেশ্বরেরই আছে।

স্কন্ধকাটা: বাজে কথা আপনি বলছেন দাদু! আপনি জানেন নাইনটিন থার্টি সেভেনে গান্ধিজী একজন মুসলিম নেতার সঙ্গে বসে পেঁয়াজ দিয়ে মুড়ি খেয়েছিলেন।

পেত্নীসুন্দরী: হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক তাই! মহানায়ক নাথুরাম সিনেমায় এই দৃশ্য দেখান হয়েছে। ইতিহাসবিদ-রা অবশ্য বলেছেন এর কোনও ভিত্তি নেই।

স্বর্গতভক্ত: ইতিহাসবিদরা কিস্যু ইতিহাস জানেন না। ভাবতে অবাক লাগে যে আমরা অর্থনীতি বুঝি অর্থনীতিবিদদের থেকে।

একানড়ে: মলো যা! হার্টের চিকিৎসার পরামর্শ কি তবে বাস্কেটবল খেলোয়াড়ের কাছ থেকে নেব?

পেত্নীসুন্দরী: না নিতে চাইলে নেবেন না! কিন্তু যাঁরা দেশের গরীব লোক, যাঁদের চিকিৎসে করার পয়সা নেই তাঁরা কোথায় যাবে? তাঁদের জন্য ভারতেশ্বর রেডিওতে পরামর্শ দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন, চারবেলা কঠোর পরিশ্রম করে গলগল করে ঘামতে হবে। এসিতে বসে ঘামতে পারলে আরও ভাল হয়। এতে স্কিন চকচকে তো হবেই, হার্টও ঠিক থাকবে।

স্বর্গতভক্ত: যাঁদের হার্টে কেবল পাকিস্তান হার্ট খারাপ তাঁদেরই হয়। আজ অবধি কোন দেশভক্তের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে? ব্রেন স্ট্রোক হয়েছে?

ব্রহ্মদৈত্য: ওসব হওয়ার জন্য হার্ট-ব্রেন থাকা চাই।

স্কন্ধকাটা: দেশ জুড়ে কী সব আন্দোলন হচ্ছে শুনলাম!

মামদোভূত: হিংসে! হিংসে! দেশ তরতর করে পাকিস্তান হয়ে যাচ্ছে, জিডিপি পাকিস্তানের মত হয়ে যাচ্ছে, বেকারত্বও তাই —এতেই হিংসে! এদিকে বাঙলার ঘরে ঘরে বাংলাদেশী! তাঁদের চিঁড়ে খাওয়া দেখেই আমরা সত্যটা ধরে ফেলেছি। ভাবতে পারেন, বাঙলা যখন পাকিস্তান হয়ে যাচ্ছে তখন মুখ্যমন্ত্রী কবিতা লিখছেন —ড্যাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং/ চিংড়ি দিল রুইকে ল্যাং!

ব্রহ্মদৈত্য: আমরা মানুষ নিয়ে এত ভাবছি কেন? আমাদের চিন্তন বৈঠকের উদ্দেশ্য ভূতের ভবিষ্যৎ। আমাদের কি কাগজ লাগবে?

স্বর্গতভক্ত: দেশভাগের পর যখন হিন্দুদের মেরে তাড়ানো হল তখন আপনারা কোথায় ছিলেন?

স্কন্ধকাটা: তখন তো আমি জন্মাইনি রে ভাই!

মামদোভূত: জন্মান নি? প্রমাণ আছে? কেন জন্মান নি? আপনাদের উচিত পেছনে লাথি মেরে বের করে দেওয়া!

স্কন্ধকাটা: অ্যাই! মুখ সামলে কথা বলবি!

পেত্নীসুন্দরী: খবরদার! সেনা পাঠিয়ে তুলে নিয়ে যাব! আপনারা নেতাজিকে একান্ন সালে খুন করেছিলেন!

মেছোভূত: অবজেকশান! তাই যদি হবে তবে নেতাজিকে সাতান্ন সালে ক্যারাবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে দেখা গেল কী ভাবে?

ব্রহ্মদৈত্য: আঃ! এটা চিন্তন বৈঠক। ঝগড়া করার জায়গা নয়।

পেত্নীসুন্দরী: চিন্তা করা মানে ঝগড়া করা। যে যত বড় চিন্তাবিদ সে তত বড় ঝগড়ুটে।

একানড়ে: মোটেই না!

স্বর্গতভক্ত: আপনি ভুল জানেন! যুক্তি দিয়ে যা প্রমাণ করা গত সত্তর বছরে সম্ভব হয় নি তা ঝগড়ার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

ব্রহ্মদৈত্য: কী প্রমাণিত হয়েছে?

স্বর্গতভক্ত: জহরলাল নেহেরু মুসলিম ছিলেন।

ব্রহ্মদৈত্য: এটা আর কেউ খাচ্ছে না। নতুন কিছু বলুন।

মামদোভূত: শাহবাগের আন্দোলনকারীরা সব পাকিস্তান থেকে এসেছেন!

একানড়ে: তা হলে বিএসএফ বসে বসে কী করছিল?

পেত্নীসুন্দরী: ওরা সবাই ২০১৪-এর আগে ঢুকেছে এ দেশে। এনআরসি-সিএএ হলে সবাই ধরা পড়ে যাবে তাই আন্দোলন করছে।

ব্রহ্মদত্যি: বেশ। তবে আমিও ফরমান জারি করছি যে কাগজ না দেখালে ভূতদের মহাশ্মশান থেকে লাথি মেরে বের করে বাংলাদেশের কবরখানায় পাঠিয়ে দেব!

স্বর্গতভক্ত: অপূর্ব! এতদিনে কথার মত কথা বলছেন।

ব্রহ্মদৈত্য: আমরা সবাই আগে মানুষ ছিলাম। তার অনেক আগে আমরা বাঁদর ছিলাম। কে কোন বাঁদর থেকে এসেছেন সেটা অবিলম্বে খুঁজে বার করুন। আধার কার্ড সংশোধন করুন। কার্ডে বাপের নাম ছাড়াও যে বাঁদর থেকে এসেছিলেন তাঁর ফোটো আর নাম না থাকলে লাথি মেরে দেশ থেকে ভাগিয়ে দেব।

পেত্নীসুন্দরী: মানে? আগে আপনি আপনার পূর্বপুরুষ বাঁদরের নাম আর ছবি দেখান!

ব্রহ্মদৈত্য: (পৈতে বের করে) বটে! আপনারা হিন্দুরাষ্ট্র গড়বেন আবার বামুনের কাছ থেকে কাগজ চাইবেন! এমন মন্ত্র পড়ব যে আপনাদের সোয়াবিনের তরকারি গরুর মাংস হয়ে যাবে। কান খুলে শুনে নিন! আপনাদের পূর্বপুরুষ বাঁদরেরা যদি রামের সেনাবাহিনীতে যোগদানের কাগজ দেখাতে পারে তবে ঠিক আছে। নইলে ধরে নেব তারা পাকিস্তানি বাঁদর।

স্বর্গতভক্ত: সে কী কথা!

একানড়ে: সেটাই কথা ভাই! বাঁদর হলেই কি ভারতীয় হবে? বাঁদর কি ভারতে বাইরে জন্মায় না?

(দমকা হাওয়ায় চিতার আগুন নিভে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল)

অনু ঘটক

EKHON DUARS, Vol-6, Issue-11 WBBEN/2014/56733 Rs. 20 only

ডুয়ার্সের বইপত্র। রংরুটের বইপত্র। ছোটদের বইপত্র

বিষয় ডুয়ার্স

ডুয়ার্স বেস্ট সেলার

তিস্তা - উৎস থেকে মোহনা। অভিজিৎ দাশ। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি। দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা ***
চায়ের ডুয়ার্স কী চায়? গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা
ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে? সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা ***
আলিপুরদুয়ার। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
কোচবিহার ২য় সংস্করণ। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
জলপাইগুড়ি। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ৩০০ টাকা
এখন ডুয়ার্স সাহিত্য ২০২০। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৯৫ টাকা
গণ আন্দোলনে কোচবিহার। হরিপদ রায়। ২৪০ টাকা
রাণী নিরুপমা দেবীর নির্বাচিত রচনা। দেবায়ন চৌধুরী। ১৬০ টাকা

ডুয়ার্সের গল্প সংকলন

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা ***
লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
সব গল্পই প্রেমের নয়। হিমি মিত্র রায়। ১৬০ টাকা
দিল সে দিল্লী সে। কল্যাণ গোস্বামী। ২৯৫ টাকা

ডুয়ার্সের পেপারব্যাক সিরিজ

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস। সংকলন। ১৯৫ টাকা
তরাই উৎরাই। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৬৫ টাকা
লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা
শালবনে রক্তের দাগ। ১২৫ টাকা
অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
কুহুলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা
বোধিবৃক্ষ ছুঁয়ে এক চির ভিক্ষুক। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা
সিকিম। সংকলন। ২০০ টাকা ***
নর্থ ইস্ট নট আউট। গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা
রংরুটে হিমালয় দর্শন। সংকলন। ২০০ টাকা ***
উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে। প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা ***
সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে। সংকলন। ১৫০ টাকা ***
মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা উর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা ***
সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা ***

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা
জয় জল্পেশ। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৯০ টাকা

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা ***
সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা
পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
তিন মহাদেশ দশ দিগন্ত।
শান্তনু মাইতি। ১৭৫ টাকা
মুর্শিদাবাদ। জাহির রায়হান। ১৯৫ টাকা
বাংলার উত্তরে টই টই। দ্বিতীয় সংস্করণ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৯৫ টাকা

শিশু কিশোরদের

গাছ গাছালির পাঠ পাঁচালি।
শ্বেতা সরখেল। ১৯৫ টাকা
ডুয়ার্স ভরা ছন্দ ছড়া।
বৈকুণ্ঠ মল্লিক সম্পাদিত। ১৯৫ টাকা

এখন ডুয়ার্স

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।

হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৬২৯৭৭৩১১৮৮ নম্বরে

ন্যূনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

*** প্রায় নিঃশেষিত

অনলাইনে কিনুন আমাদের বইপত্র **www. dooarsbooks.com**

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.